# নভেল কত প্রকার।

## ( দ্বিতীয় প্রস্তাব )

পূর্ব্বে নভেলের শ্রেণীবিভাগ করিতে গিয়া আমরা স্বভাব-বর্ণনা-প্রধান ও চরিত্র-প্রধান নভেলের কথা বলিয়াছি। ইহা ব্যতীত সমাজ-প্রধান নভেলের মধ্যে যেগুলি উদ্দেশ্যমূলক, তাহাদের কথাও বলা হইয়াছে। এক্ষণে আমরা সামাজিক নভেল সম্বন্ধে অন্য কথা বলিব।

সামাজিক নভেলের মধ্যে আর এক রূপ নভেল আছে। ইহাদিগকে নীতি-মূলক নভেল বলে। আমরা পূর্ব্বে নীতি-মূলক নভেলের কথা বলিয়াছি, দেখাইয়াছি যে, এরূপ নভেলে শিল্পের বিশেষ ব্যাঘাত হয়। এস্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে, সকল শ্রেণীর সামাজিক নভেলেই শিল্পের ভাল স্ফূর্ত্তি হয় না। চরিত্রকে স্বরূপে দেখান-তেই—চরিত্রের মূল সূত্র তাহার আভ্যন্তরিক শক্তি-ক্রিয়ার স্বরূপ দেখানতেই শিল্পের বিশেষ স্ফূর্ত্তি হয়। এরূপ নভেলে চরি-ত্রের স্বাভাবিক চিত্র থাকে না। ইহাতে সমাজের জন্য চরিত্রের এক অংশ বাদ দিয়া এক অংশ মাত্র চিত্রিত করা হয়—তাহা কখন স্বাভাবিক হয় না। এই জন্যই এই শ্রেণীর নভেলে বিশেষ শিল্প-চাতুর্য্য থাকে না। এই জন্যই ইহারা প্রকৃত পক্ষে নিকৃষ্ট শ্রেণীর নভেল। কারণ শিল্পই নভে-লের প্রাণ।

এই নৈতিক নভেল গুলিও কতকটা উদ্দেশ্যমূলক। কারণ সমাজের মধ্যে যাহাতে বিশৃঙ্খলা না হয়—যাহাতে সকলে ধর্ম্মপথে নীত হয়—তাহাই এই সকল নৈতিক নভে-লের উদ্দেশ্য। যদি সাধারণে অধার্ম্মিক হয়, সমাজ বন্ধন না মানে—সাধারণের যাহাতে অপকার হইবে—বা সাধারণের সুখের পথে যাহা অন্তরায় হইবে, যদি অধিকাংশ লোকে এরূপ কাজ করে, তবে সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়া যায়—সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। অবশেষে যদি তাহার প্রতি-বিধান না হয়, তবে ধ্বংশের দিকে সমাজের গতি হয়। যাহাতে সমাজের এরূপ দুর্দ্দশা না হয়—যাহাতে লোকের সুনীতি বজায় থাকে—যাহাতে লোকে সমাজের হিতকারী নিয়ম গুলিকে লঙ্ঘন না করে—নৈতিক নভেলের তাহাই উদ্দেশ্য।

সকলেই জানেন যে, প্রধানত সমা-জের জন্যই নীতির আবশ্যক। মনে কর, আমি যদি চুরি করি ( অন্তত নিষ্কাম ভাবে অথবা দোষ করিতেছি মনে না করিয়াও চুরি করি, অথবা যদি তাহাতে আমার বিক্ষেপ শক্তির বিশেষ উত্তেজনা না হয় ) তাহাতে অবস্থাবিশেষে আমার বিশেষ হানি না হইতে পারে, কিন্তু সাধা-রণের তাহাতে নানা কারণে বিশেষ ক্ষতি। এই জন্য চুরি প্রভৃতি দোষ গুলিকে প্রধা-নত সমাজ সম্বন্ধে অপরাধ বলা যায়। এই রূপ নানাকারণে সহজেই বুঝা যায় যে, সমাজের জন্য নীতির যতদূর আবশ্যক, ব্যক্তি বিশেষের জন্য ততদূর নহে। সুতরাং নীতি-প্রধান-নভেল গুলিতেও চরিত্র স্ফূর্ত্তির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয় না। চরিত্রের মধ্যে নৈ-তিক বৃত্তির ক্রিয়া যতটুকু, প্রধানত তাহাই দেখাইয়া দেওয়া হয়; সে চরিত্রের নৈতিক ভাব, নৈতিক চিন্তা, বা নৈতিক কার্য্যই

চিত্রিত করা হয়। চরিত্রের মধ্যে যেটুকু সুনীতি বা কুনীতি মূলক বৃত্তি বা কার্য্য, তাহাই অঙ্কিত করিয়া তাহার ঘাত প্রতিঘাত, তাহার ফলাফল, অন্য চরিত্রের উপর বা সমাজের উপর তাহার ফলাফল দেখাইয়া দেওয়া হয়। সকলেই জানেন, মনোবৃত্তিই আমাদের নৈতিক ভাবের উত্তেজক। যদি আমাদের পরার্থপর বৃত্তি উত্তেজিত হয়, তবে আমরা সুনীতির অনুসরন করি। আর যদি স্বার্থপর বৃত্তির বিশেষ স্ফূর্ত্তি হয়, তবে আমরা প্রায়ই কুনীতির বশবর্ত্তী হই, নিজের স্বার্থের জন্য পরের কষ্ট—পরের দুঃখের দিকে কটাক্ষও করি না। এই জন্য নীতিমূলক সামাজিক নভেলে চরিত্রের স্বার্থপর ও পরার্থপর বৃত্তিরই কার্য্যপ্রণালী বিশেষ করিয়া দেখাইয়া দেওয়া হয়, এবং সেরূপ কার্য্যে সমাজের বা সে চরিত্রের কিরূপ ইষ্ট বা অনিষ্ট হয়, তাহাও বুঝাইয়া দেওয়া হয়। অতএব এরূপ নভেলে, চরিত্রের অন্য সমস্ত মানসিক বৃত্তির কার্য্যপ্রণালী, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি বা সম্বন্ধ দেখাইয়া দেওয়া হয় না। অথবা স্বার্থপর বা পরার্থপর বৃত্তি গুলিরও স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ কার্য্যপ্রণালী দেখাইয়া দেওয়া হয় না।

আর এক কথা, সংসারে সকল সময়ে কিছু পাপীর শাস্তি বা পুণ্যাত্মার পুরস্কার হয় না; বরং সচরাচর পাপী স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইয়া যায়—আর পুণ্যাত্মা বরাবর দুঃখ পায়—ইহাই দেখিতে পাই। প্রকৃত কবি-শিল্পী কিছু সংসারে যাহা ঘটে, তাহার বিপরীত বর্ণনা করিতে পারেন না। কিন্তু নৈতিক নভেল-লেখকের সেরূপ না করিলে চলে না। এই সংসারেই পাপের দুর্দ্দশা ও পুণ্যের পুরস্কার করিতে হইবে। সৎকার্য্যের সুফল ও অসৎ কার্য্যের কুফল দেখাইতে হইবে। কাজেই এই শ্রেণীর নভেল-লেখকের শিল্প কৌশলের দিকে দৃষ্টি করিলে চলে না। এই জন্যই এরূপ নভেলে চরিত্র চিত্রের বিশেষ স্ফূর্ত্তি হয় না।

এই শ্রেণীর অধিকাংশ নভেলের এক দোষ এই যে, যাহাতে সমাজের কোন পরিবর্ত্তন হয়—বা সমাজ যে পথে চলিতেছিল তাহার অন্যথা হইবার সম্ভব হয়, ইহাতে এরূপ কার্য্য বা এরূপ ঘটনা দেখান হয় না। সুতরাং চরিত্রের স্বাধীন স্ফূর্ত্তি—বা তাহার স্বাধীন ক্রিয়া দেখান এ শ্রেণীর নভেলের উদ্দেশ্য নহে। টেন্ সাহেব বলিয়াছেন যে, এরূপ নভেল-লেখকগণ সচরাচর রক্ষনশীল প্রকৃতি (conservative) সম্পন্ন হয়। পাছে চরিত্রের স্বাধীন ক্রিয়া দেখিয়া লোকে স্বাধীন ভাবে চলিতে ইচ্ছা করে, পাছে তাহারা সমাজের নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবান না হয়—পাছে চলিত নীতির উপর তাহাদের আদর না থাকে, এই ভয়ে তাঁহারা এরূপ চরিত্র আঁকিতে সাহস করেন না। আবার আর এক দিক দিয়া দেখিলে এই শ্রেণীর কোন কোন নভেলে ইহার ঠিক বিপরীত দেখা যায়। মনে কর প্রায় সকল সমাজে এরূপ অনেক রীতি বা ব্যবহার প্রচলিত আছে, যাহা উন্নত নীতির অনুমোদিত নহে। নভেল-লেখক যদি সমাজ সংস্কারকের পথে দাঁড়াইতে যান—তবে তিনি এই সকল কুনীতির দোষ দেখাইতে বিশেষ চেষ্টা করিবেন—যাহাতে লোকের মনে সমাজের এ প্রথাগুলিকে কুরীতি বলিয়া বিশেষ রূপে ধারণা হয়, তাহা করিতে চেষ্টা করিবেন। এরূপ

অবস্থায় সমাজের তদানিন্তন অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্ত চেষ্টা করায়, চরিত্র গুলি অতিরঞ্জিত হইয়া যায়, একটী চরিত্র লইয়া তাহার স্বাধীন স্ফূর্ত্তি করিতে হইলে—এ কথা ভাল করিয়া বুঝান যায় না। বলিয়াছি এ গুলিও এক শ্রেণীর উদ্দেশ্য মূলক নভেল। সুতরাং উদ্দেশ্যমূলক নভেলের যে দোষ আছে,ইহাতেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। আর যখন এরূপ নভেলে শিল্পই বিশেষ বিকৃত হয়, তখন ইহাদের প্রকৃত নভেলত্ব নষ্ট হইয়া যায়।

আবার এই নীতি মূলক নভেলেই ব্যঙ্গের অবতারণার বিশেষ প্রয়োজন হয়। দুর্নীতিকে ব্যঙ্গ করিয়া তাহাকে অপদস্থ করা—তাহার প্রতি লোকের বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দেওয়া এরূপ নভেলের একটী প্রধান অঙ্গ। কতক কথা অতিরঞ্জিত করিয়া, আবার কতকগুলি বিষয় অল্প রঞ্জিত করিয়া নভেল-লেখক আপনার উদ্দেশ্য সাধন করেন। বিশেষতঃ অনেক সময়ে দোষ দমন করিতে হইলে, ব্যঙ্গ বা এইরূপে তাহাদিগকে অতিরঞ্জিত (caricature) করাই নভেল-লেখকের প্রধান অঙ্গ হইয়া থাকে। বিলাতে স্মোলেট, ডিকেন্স, থেকারেরি প্রভৃতি অধিকাংশ নৈতিক নভেল লেখকই এই উপায়ে আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বলিয়াছি এরূপ নভেলে শিল্প কৌশল বিকৃত হয়—যাহাতে নভেলের নভেলত্ব, তাহাই নষ্ট হইয়া যায়।

এই নৈতিক নভেলের কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে, এসম্বন্ধে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। আমরা পূর্ব্বে নভেলের রুচি সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়াছি। এই শ্রেণীর নভেলে অনেক সময়ে রুচি রক্ষা হয় না। কারণ পাপকে অরুচিকর ঘৃণার্হ জনক করিয়া বর্ণনা না করিলে সাধারণের তাহার প্রতি ঘৃণা বা অরুচি হইবে কেন? এই জন্ত এই সকল সদুদ্দেশ্যপূর্ণ নভেলেও অনেক সময়ে খ্যাত-নামা নভেল লেখকগণও রুচি-বিরুদ্ধ অনেক বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কথাটী কিছু আশ্চর্য্য জনক বটে। নীতির জন্ত দুর্নীতি দেখাইতে হয়, রুচির জন্ত অরুচিকর বিষয়ের অবতারণা করিতে হয়—স্বর্গের পথে নরকের ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া যাইতে হয়। পাকা লেখকের হাতে অনেক সময়েই এই রুচিবিরুদ্ধ বিষয়ের বর্ণনাই বিশেষ ফলোপযোগী হয়। কিন্তু সাধারণ লেখকগণ এ পন্থা অবলম্বন করিলে প্রায়ই বিফল মনোরথ হন, এবং তাহারে সাধারণকে পাপের দিকে আরও অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করে। হয়ত রেনল্ডের নভেলে,পাপের কদাচার বর্ণনা করিয়া সাধারণের যাহাতে পাপের উপর ঘৃণা জন্মায়, তাহারই চেষ্টা করা হইয়াছে—হইতে পারে এগুলির উদ্দেশ্য সুনীতি বিস্তার করা। কিন্তু গ্রন্থকার তাহাতে সম্পূর্ণ রূপে বিফল মনোরথ হইয়াছেন। আবার দেখুন, বঙ্কিম বাবু চন্দ্রশেখরে শৈবলিনীর প্রতাপাভিসরণের পাপময় চিত্র অঙ্কিত করিলেও, তাহাতে এরূপ পাপের উপর ঘৃণা আমাদের আরও বর্দ্ধিত হয়—সুরুচির প্রশ্রয় দেওয়া হয়—ইহাতে আমাদের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি উত্তেজিত করে, অথচ অধর্ম্মের দিকে মনকে আকর্ষণ করে না। রোহিণী বা হীরার চরিত্র সম্বন্ধেও অনেকটা একথা বলা যাইতে পারে। তাই বলিতেছি, এই নীতি-মূলক নভেলেও অনেক সময়ে কুরুচির অবতারণা করিয়া

নভেল-লেখক স্বীয় অভীষ্ট সাধন করেন।* তবে যখন এই কুরুচি আমাদের কুরুচি বৃদ্ধি করে—আমাদের পাপ বৃত্তির উত্তেজনা করে, তখনই ইহা বিশেষ নিন্দনীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন আমরা ইহার দ্বারা স্বকার্য্য উদ্ধার করিতে পারি, সমাজের কণ্টক (কণ্টক দ্বারা) দূর করিতে পারি, তখন নভেলে ইহাদিগের অবতারণা নিন্দনীয় হওয়া উচিত নহে। তবে এক কথা এই যে, সাধারণ লেখকের হাতে কুরুচি বড়ই কুফল প্রসব করে। কৌশলী লেখকের সংখ্যা বড় অল্প, এই জন্যই সাধারণত সর্ব্বত্রই কুরুচির অবতারণা না করা উচিত। আর এক কথা, যেখানে কুরুচির অবতারণা না করিয়া গ্রন্থকার স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারেন—সহজ উপায়ে পাপের দুরবস্থা বুঝাইয়া দিতে পারেন, তবে সে স্থলে ইহার অবতারণা না করাই কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতীত কুরুচি অবতারণা করিবার একটা সীমা আছে—যাহা গ্রন্থকার কোন কারণেই অতিক্রম করিতে পারেন না। তবে এই সীমা সমাজের অবস্থা-বিশেষে পরিবর্ত্তন হয় এই মাত্র। পাঠকগণ ইহাতে যেন মনে না করেন যে, আমরা কোন রূপে কুরুচির পোষকতা করিলাম। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, শিল্পের জন্য—প্রকৃত কবিত্বের জন্য, যতটুকু প্রয়োজন, তাহাকে কুরুচি বলা যায় না। কাল হিলের মত কঠোর নীতিবেত্তা ও ধর্ম্মভীরু লেখকও তাহাকে কুরুচি বলেন না। আমরা এস্থলে দেখাইলাম যে, অতি সদুদ্দেশে সুনীতি প্রচারের জন্যই কোন কোন খ্যাতনামা লেখকও কুরুচির অবতারণা করিয়া থাকেন। যতক্ষণ ইহা স্বকার্য্য সাধনে সমর্থ হয়, ততক্ষণ ইহা দূষনীয় নহে।* নতুবা অন্য সকল অবস্থাতেই ইহার অবতারণা নিতান্ত অন্যায় ও অপকারী—দণ্ডবিধি অনুসারে তাহার দমন হওয়াই উচিত, ও সমাজের সুশৃঙ্খলার জন্য বিশেষ আবশ্যক।

এই সামাজিক নভেলের মধ্যে উদ্দেশ্যমূলক নভেল ব্যতীত আর এক শ্রেণীর

---

* W. Forsyth, তাঁহার Novel and Novelist নামক পুস্তকে বলিয়াছেন:—

"What is the character of most of these novels, which were to correct follies and regulate morality? Of a great many of them, and specially those of Fielding and Smolltte, the prevailing features are grossness and licenciousness. Love degenerates into a mere animal passion.........The language of the characters abounds in oaths and gross expressions...... The heroines allow themselves to take part in conversations which no modest woman would have heard without a blush."

* W. Forsyth তাঁহার Novel and Novelist নামক পুস্তকের এক স্থানে বলিয়াছেন:—

"The novels to correct follies and regulate morality, whose prevailing features were grossness and licenciousness, were the delight of by-gone generation and were greedily devoured by women as well as man. Are we therefore to conclude that our great-great-grand-fathers.........were less chaste and moral, than their female posterity? I answer certainly not; but we must infer that they were inferior to them in delicacy and refinement. They were accustomed to hear a spade called a spade, and words which would shock the most fastedious ear in the reign of Queen Victoria, were then in common and daily use."

আমাদেরও কতকগুলি পুরাতন "সুরুচিপূর্ণ" কাব্য সম্বন্ধে এ কথাটা বলা যাইতে পারে।

এই সমস্ত টাইপ চরিত্রের অধিক বিশেষত্ব থাকে—তবে তাহা টাইপ হইতে বড় দূরে গিয়া পড়ে, সুতরাং তাহাদ্বারা সমাজ বর্ণনা চলে না।

এই সামাজিক আচার ব্যবহার মূলক নভেলকেও আবার তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারা যায়। যে সময়ে সমাজের প্রথম স্ফূর্ত্তির অবস্থা থাকে, অথবা যত দিন পর্য্যন্ত সেখানে বীরত্বের গৌরব থাকে—সাধারণ লোকে সচরাচরই শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে,—আত্মরক্ষার্থে হউক, অন্য লোককে রক্ষার্থ হউক—সমাজে যত দিন বীরত্বের বিশেষ আবশ্যক থাকে, এক কথায় যত দিন পর্য্যন্ত সমাজে বিশৃঙ্খল ও বীরত্বের সময় থাকে, সে সময়ের সামাজিক অবস্থা চিত্রিত করিতে হইলেই বীর কাহিনীর বিশেষ অবতারণা করিতে হয়। তখন সমাজ চিত্র করিতে হইলে বিপদ, উৎশৃঙ্খলতা, অত্যাচার, কার্য্য-তৎপরতা, ধন প্রাণের অরক্ষিত অবস্থা ও অশান্তি, এই সকলই চিত্রিত করিতে হয়। মহা ঝটিকা মধ্যে সমুদ্রে জাহাজ যেমন আকুলিত হয়—মানুষও তেমনি বিপদে পড়িয়া আপনা হারা হইয়া পড়ে। তখন স্বাধীন মনের স্ফূর্ত্তি কোথায়—স্বাধীন কার্য্যের স্থান কোথায়? সুতরাং এরূপ অবস্থায় চরিত্রের স্ফূর্ত্তি হয় না—বা যে নভেলে এরূপ সমাজের চিত্র থাকে, তাহাতেও চরিত্র চিত্র করা সম্ভব হয় না। তবে এ সময়ের সকল সমাজেই, সকল জাতিতেই দেখিতে পাই, কতকগুলি বীর পুরুষ এই বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া, আপনার বিপদ তাচ্ছিল্য করিয়া, বিপন্নকে রক্ষা করিতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করেন। সমাজের অন্ধকার রজনীতে তখন এই কয়টী মাত্র নক্ষত্র দেখা যায়। সেই জন্য এসময়ের নভেলে প্রধানত এইরূপ চরিত্রই অধিক পরিমাণে চিত্রিত হয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এইরূপ নভেলগুলিকে ইংরাজীতে রোমান্স বলে। আর এই সময়ের সমাজের রীতি নীতি বা অবস্থাকে ইংরাজিতে Chivalrous manners বলে। সুতরাং এরূপ নভেলগুলিকে novel of Chivalrous manners বলা যায়।

ইহার পর সমাজের আর এক অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়—এই অবস্থাই সমাজে অধিক দিন থাকে। এসময়ে পূর্ব্বেকার বিশৃঙ্খলতা দূর হইয়া যায়। সমাজের মধ্যে আর এত অশান্তি, অরাজকতা বিরাজ করে না। তখন রাজার অধীন থাকিয়া, রাজার সুশাসনে থাকিয়া সমাজ শান্তি ভোগ করে। কিন্তু এ সময়ে রাজার ক্ষমতা অসীম—সমাজ সবে মাত্র অশান্তি হইতে শান্তিতে আসিয়াছে—যাহার দ্বারা সমাজের সুবন্দোবস্ত হইল, তাহাকে সমাজের লোক এ সময়ে দেবতা বলিয়া পূজা করে। আরও তখন সমাজ একরূপ কিছুই নহে, রাজাই সর্ব্বে সর্ব্বা। তখন সমাজের রীতি নীতি বা আচার ব্যবহারের বড় বিশেষ অস্তিত্ব কিছুই নাই—রাজার রীতিনীতিতেই, তাঁহার আচার ব্যবহারেই সমাজ পরিচালিত হয়। বাস্তবিক তখন কোন বিষয়েই সাধারণ লোকের বিশেষ অস্তিত্ব নাই, অথবা তাহা বড় দেখা যায় না—তাহা ফল্গু নদীর ন্যায় অদৃশ্য ভাবে বহিতে থাকে, বাহিরের লোক তাহা দেখিতে পায় না। এই জন্য এ সময়ে সমাজের ইতিহাস বা দেশের ইতিহাস, রাজাদের কাহিনী বই

আর কিছুই নহে। তখন রাজাদের চরিত্রই সাধারণের আলোচ্য বিষয়। সুতরাং এ সময়ের নভেলও সমাজ চিত্র করিতে গিয়া রাজাদের চরিত্র অঙ্কিত করে। এ সময়ে সামাজিক নভেলগুলি ঐতিহাসিক নভেল মাত্র। এই সময়ের আচার ব্যবহার রীতি নীতিকে ইংরাজীতে Monarchical manners, ও এইরূপ নভেলকে Novel of Monarchical manners বলে।

আবার যখন সমাজের এই রূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, তখন এ শ্রেণীর নভেলেরও পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। পূর্ব্ব রূপ সমাজের অবস্থা বহুদিন থাকিলেও কিন্তু তাহা ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া, সাধারণ লোকের চরিত্র পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ হয়। মানুষ, ক্রমে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে শিখে। এই সময় হইতেই রাজার প্রভুত্ব ক্রমে ক্রমে কমিয়া যাইতে আরম্ভ হয়। মানুষ, আপনার অধিকার, আপনার স্বার্থ বুঝিতে শিখে। যদি রাজা এই সময়ে তাঁহার পূর্ব্ব সম্মান বজায় করিতে চেষ্টা করেন, তবেই সমাজে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। কখন বা সেই আন্দোলনে রাজা বা মন্ত্রী কোথায় ভাসিয়া যায়। ইংলণ্ড ও ফরাসীর রাষ্ট্রবিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা এই কারণেই ঘটিয়াছিল।

আসল কথা, এই সময় হইতেই সমাজের উপর রাজার একাধিপত্য হ্রাস হয়, লোকে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিয়া,সমাজকে আপনার ইচ্ছামত গড়িয়া লইতে আরম্ভ করে। এই জন্য এ সময়ের ইতিহাসে শুধু রাজার কাহিনী বা বড় লোকের জীবনী ব্যতীত সমাজের সাধারণ লোকের আচার ব্যবহার রীতি নীতি ও কার্য্য, সমস্তই বিবৃত হইতে আরম্ভ হয়।

এই সময় হইতেই নভেলে সাধারণ চরিত্রের উপর দৃষ্টি পড়ে। চরিত্র চিত্রই নভেলের মূল সূত্র, এজন্য এই সময় হইতেই প্রকৃত নভেল লেখা আরম্ভ হয়। ইহা ব্যতীত সামাজিক নভেলে তখন সমাজের রীতি নীতি আচার প্রভৃতি চিত্রিত করিতে হইলে সাধারণ লোকের রীতি নীতি আচার ব্যবহার চিত্রিত করিতে হয়। সেই সময় হইতে যেমন সাধারণ লোকের hero-worship বা মহাপুরুষ ভক্তি অনেকটা কমিয়া আসে—নভেলেও তাহাদিগের চিত্র অঙ্কিত করিবার তত চেষ্টা করা হয় না। বলিয়াছিত তখন আশ্চর্য্য বা অদ্ভুত ঘটনার উপর সাধারণের স্পৃহা বড়ই কমিয়া যায়। এই সকল নানা কারণে তখন সাধারণ লোকের রীতি নীতিই নভেলে চিত্রিত হয়। সমাজের এই অবস্থার রীতি নীতিকে ইংরাজীতে citizen manners বলে, আর যে সকল নভেলে তাহার বিশেষ বর্ণনা করা হয়, তাহাদিগকে novel of citizen manners বলা হয়। আমরা ইহাদিগকেই গার্হস্থ্য নভেল বলিয়া থাকি।

অতএব দেখা গেল, নভেলকে অনেক রূপে শ্রেণী বিভাগ করা যায়। আমরা দেখাইয়াছি যে প্রথমত নভেলকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) বাহ্ জগৎ প্রধান (২) চরিত্র প্রধান ও (৩) সমাজ প্রধান। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, চরিত্র প্রধান নভেলের চরিত্র চিত্র চারি প্রকার— (১) সাধারণ চরিত্রের প্রতিচিত্র (২)চরিত্রের কাল্পনিক প্রতি-চিত্র, (৩) সাধারণ ও কাল্-

নিক চরিত্রের স্ফূর্ত্তি ও পরিণতির চিত্র, আর (৪) চরিত্রের বৃত্তি বিশেষের চিত্র। এই চরিত্র চিত্র অনুসারে নভেলও চারিপ্রকার হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত চরিত্রকে যেরূপে চিত্রিত করা হয়, তদনুসারেও নভেলকে তিন প্রকারে বিভক্ত করা যায় (১) বুদ্ধি-মূলক চরিত্র প্রধান নভেল, (২) বৃত্তি মূলক চরিত্র প্রধান নভেল, আর (৩) কার্য্য-মূলক চরিত্র প্রধান নভেল. আবার সামাজিক নভেলের মধ্যেও এক শ্রেণীর নভেল, (১) উদ্দেশ্য মূলক, কেহবা (২) নীতিমূলক আর এক শ্রেণীর সামাজিক আচার ব্যবহার মূলক নভেলের মধ্যে কতকগুলি বা (৩) রোমান্স, কেহ (৪) ঐতিহাসিক নভেল, আর কেহ (৫) গার্হস্থ্য নভেল। ইহা ব্যতীত নভেল গুলিকে আবার (১) কাল্পনিক (idealistic) (২) স্বাভাবিক (realistic) (৩) সাধারণের উপযোগী (practical) ও (৪) বৈজ্ঞানিক (scientific) এরূপ ভাগেও বিভক্ত হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, প্রধান কথা এই যে, শিল্প কৌশল দেখিয়াই উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট নভেল বাছিয়া লইতে হয়। অন্য কথা বারান্তরে বলিব।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু

---

# সময়-ক্রিয়া।

দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার জগতের নিত্য ঘটনা। সারিকা দুর্ব্বল পতঙ্গ বধ করিয়া ভক্ষণ করে, সে কীট ক্ষুদ্রতর কীটাণু বা উদ্ভিদ-জীবী। পক্ষান্তরে সারিকা শ্যেনের ভক্ষ্য, সে শ্যেন আবার ব্যাধের খরশান বাণ প্রহারে হত হয়। আমার কত সাধের আনন্দ-কুটীর ভূকম্পনে ধরাশায়ী হইল, প্রমোদ কুঞ্জ ঝটিকাঘাতে ছার খার হইল, বনমালা নিদাঘ তাপে শুখাইয়া যাইল। যাহাকে ধন প্রাণ, মন বল, যৌবন স্বাস্থ্য, সকলি উৎসর্গ করিয়া লালন পালন করিলাম, বুকের আঁধার আলো করিবার একমাত্র কোহিনুর, অন্ধের চক্ষু, খঞ্জের যষ্টি, আমার সে সুকুমারকে আমার বুক ছিনিয়া দেবতা লইয়া যাইলেন! কে বলে দয়ামায়া দেবতার আছে? তুমি বাঙ্গালার সিরাজউদ্দৌলা, সহরের সাহেব, গ্রামের জমীদার, তোমার ধনবল ও লোক বলের অভাব নাই, আমি দীন হীন দরিদ্র অসহায়, আমার দশ বিঘা ব্রহ্মত্তর ছিল, তুমি তাহা কাড়িয়া লইলে। আমার ঘরে পতিপ্রাণা প্রেমময়ী ছিল, তোমার দুর্দ্দাম লালসা চরিতার্থ করিতে তুমি আমার মস্তকে লাঠী ও বুকে ছুরিকা আঘাত করিয়া, তাহাকে অপহরণ করিলে। আমার সর্ব্বনাশ করিলে আমি রাজার শরণ লইলাম, রাজা তোমারই সহায় হইলেন। দেবতার ন্যায় মনুষ্য, মনুষ্যের ন্যায় পশুপক্ষী সকলেই নির্ম্মম, নির্দ্দয়। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার জগতের নিত্য ঘটনা।

যাহা নিত্য ঘটনা, যাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় নাই, তাহাই স্বাভাবিক, তাহাই জগতের নিয়ম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বনবাসী আদিম দার্শনিক, যখন বনবাসী বর্ব্বর সমীপে দর্শন শাস্ত্রের প্রথম বীজ বপন করিয়াছিলেন, প্রতিবেশী ও সন্তানগণ অনিবার্য্য দুঃখে প্রপীড়িত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে যখন কাতর

চক্ষে চাহিয়া থাকিত, তখন ইহাই বলিয়া দার্শনিক মণ্ডল তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেন। আজ সভ্য সমাজে বসিয়া আমরা যে বড় অধিক শান্তিপ্রদ হৃদয়গ্রাহী কোন মীমাংসা করিতে সক্ষম হইয়াছি, বোধ হয় না। কপাল বল, কর্ম্মফল বল, স্বভাবের নিয়ম বল, দগ্ধ হৃদয়ে শান্তি দিতে সকলেই সমান। মানবের অনন্ত নরক ভোগ কিছুতেই প্রশমিত হইবার নহে।

সে যাহা হউক, প্রবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিবে, ইহা স্বভাবের নিয়ম বলিয়া নানা বর্ব্বর সমাজে প্রচারিত আছে। অত্যাচার সফল না হইলে, দুর্ব্বলকে মনের সাধ মিটাইয়া যন্ত্রণা দিতে না পারিলেই প্রবলের অনুতাপ। কারণ সে যে প্রবল নহে, অন্তত যত বলবান বলিয়া তাহার বিশ্বাস ছিল সে যে তত বলবান নহে, ইপ্সিত সাধনে বিফলতাই তাহার প্রমাণ। এই বিফলতা তাহার সমাজে তাহার নিন্দার কারণ, এবং তাহার পদহানির কারণ। সুতরাং যে দুর্ব্বল তাহার মনোবাঞ্ছা বিফল করে, তাহার প্রতি তাহার মর্ম্মান্তিক আক্রোশ রয়, সে জীবনে মরণে, দেশে বিদেশে, বনবাসে ও মরুস্থলে, নদীস্রোতে ও সাগর গর্ভে বস্তু হস্তে তাহার অনুসরণ করে।

দুর্ব্বলের নালিশ নাই, কাঁদিবার নাই, ভাবিবার নাই। যদি স্বহস্তে সে অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে পারে, তবেই যাহা হউক। দেবতা হউক, মনুষ্য হউক, আর পশু পক্ষীই হউক, যদি আপন বলে অত্যাচারীকে দণ্ড দিতে পারিলাম ত ভাল, নতুবা পড়িয়া পড়িয়া প্রহার সহ্য করিতে হইবে, আর কেহ আমার হইয়া সাহায্য করিবে না, সাহায্য করা দূরে থাকুক, "আহা" বলিয়া কেহ এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিবে না। প্রবল-পীড়িত আমি বর্ব্বর সমাজের কুষ্ঠরোগী, অত্যাচারী রেবতাকে শাসন করিতে আমি, মনুষ্যের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিতে আমি, শ্বাপদের হিংসা দমন করিতে আমি। অত্যাচার ও প্রতিহিংসা, অসভ্য সমাজের ঐতিহাসিক ঘটনা এই দুইটী মাত্র। বিবাদ কলহ সংগ্রাম, তাহার নৈতিক অবস্থা। আপন বল বুঝিতে পারি, অত্যাচারের সহিত প্রতিহিংসার অনুপাত অন্তত সমান রাখিতে পারি, তবে টিকিয়া যাইব, নতুবা সংসারের কুরুক্ষেত্রে আমাকে সবংশে নির্ব্বংশ হইতে হইবে, শত্রু হাস্য মুখে আমার মৃতদেহে পদাঘাত করিয়া চলিয়া যাইবে। প্রতিহিংসা—হাতের বদলে হাত, চোখের বদলে চোখ, প্রাণের বদলে প্রাণ,—অনন্য সহায়ে, স্বহস্তে, এই অসভ্য সমাজের আইন কানুন। সেখানে ফৌজদারি পাঁচ আইন নাই; জজ নাই, মাজিষ্ট্রেট নাই। তুমিই তোমার সকলি। আপনি আপনাকে রক্ষা করিতে পার, তুমি তোমার মিত্র; না পার, তুমি তোমার শত্রু; আর সকলেও তোমার পক্ষে যাহা, তুমিও তোমার পক্ষে তাহা। পুরুষ স্ত্রী, বালক, বর্ব্বর সমাজে সকলেই প্রতিহিংসা-প্রিয়, সকলেই সমর-প্রিয়—প্রতিহিংসা সামরিকতার জননী—কাহাকে একটা কথা বলিয়া নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা নাই। জীবন থাকিতে একদিন না একদিন সে প্রতিশোধ লইবেই লইবে।

প্রথমে স্বহস্তে প্রতিশোধ, তাহার পর পরহস্তে প্রতিনিধির দ্বারা প্রতিশোধ। তোমার হস্তে আমার পিতা হত হইয়াছেন, তিনি প্রতিশোধ লইতে পারেন নাই, আমি

তাঁহার প্রতিশোধ লইব। যতদিন মনুষ্য পশু পক্ষীর ন্যায় প্রত্যেকে স্বতন্ত্র বাস করিত, ততদিন প্রত্যেকে স্বহস্তে প্রতিশোধ লইত। সুতরাং শত্রু পরাস্ত, হত বা তাড়িত হইলে প্রতিশোধ পরিসমাপ্ত হইত। যখন মনুষ্য পরিবার লইয়া বাস করিতে শিখিল, তখন অবধি পরিবারের যে কেহ যে কাহারও প্রতিশোধ লইতে আরম্ভ করিল। পরিবারের একজনের সহিত যাহার বিবাদ, পরিবারের সকলের সহিত তাহার বিবাদ। পরিবারের একজনের অপমানে সমস্ত পরিবার কলঙ্কিত, সুতরাং একটা পরিবার নির্ম্মূল না হইলে প্রতিশোধের সম্ভাবনা শেষ হইত না। এমন অবস্থায় পরিবারের মধ্যে বলবীর্য্যে যে শ্রেষ্ঠ, তাহারই নিকট প্রতিশোধ প্রত্যাশা করিবার সম্ভাবনা। বিবাদমান দুইটী পরিবারের সম্মুখ যুদ্ধে প্রত্যেক পরিবারের সকলে, বাল বৃদ্ধ নারী, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইত। হতভাগ্য কাপুরুষ সে যে পরিবারের কলঙ্ক মোচন উপেক্ষা করে। কখন কোনও কারণে বা বিবাদমান পরিবারের এক এক জন সমস্ত পরিবারের প্রতিনিধি রূপে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত। সেই প্রতিনিধির পরাজয়ে সমস্ত পরিবার পরাস্ত, তাহার বিজয়ে সকলে গৌরবান্বিত হইত।

প্রতিনিধি প্রথা আরম্ভ হইলে ক্রমে তাহার বিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। মিত্র, পরিবারের আত্মীয়, এক গোত্র সম্ভূত বিদেশী ক্রমে পরিবারের প্রতিনিধি রূপে নিযুক্ত হইতে থাকে। সাধারণতঃ প্রতিশোধকারী পরিবারের কেহ হইলে পরিবার গৌরবান্বিত হয়। সেই গৌরব রক্ষার্থ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন প্রধানতঃ পরিবার মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু পরিবারে উপযুক্ত লোকের অভাব হইলে পরিবারের নিকট আত্মীয় বা মিত্র প্রতিনিধি রূপে নিযুক্ত হয়। ক্রমে বেতনভোগী ভৃত্য পরিবারের হইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করে। পরিবারের কেহ পরিবারের যুদ্ধ করিলে যত গৌরব হয়, আত্মীয় করিলে তত হয় না। আবার আত্মীয় অপেক্ষা মিত্র হীনতর, এবং ভৃত্য হীনতম প্রতিনিধি। সামরিক প্রবৃত্তি হীনতার লক্ষণ এবং ধন বৃদ্ধির চিহ্ন বেতনভোগী সৈন্য। যে পরিবার, যে জাতি বা যে রাজ্যে বাহুবল যত হীন হয় এবং ধন বল যত বলীয়ান হইতে থাকে, সে পরিবার, গোত্র বা জাতির বাহিরের লোক লইয়া ততই যুদ্ধ কার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

পরিবার সম্বন্ধে যে নিয়ম, কয়েকটী পরিবার একত্র হইয়া যখন একটী জাতি গঠিত হয়, তখনও সেই নিয়ম চলিতে থাকে। দুই জাতিতে যুদ্ধ হইলে, এক জাতির সকলে বা তাহাদের প্রতিনিধিগণ যুদ্ধ করে, এবং প্রতিনিধির জয় পরাজয় সমস্ত জাতির জয় পরাজয় রূপে গণ্য হয়। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে একজন পরাস্ত হইলে, সে যাহাদের প্রতিনিধি, সে জাতির সকলে বিজয়ী জাতির অধীনতা স্বীকার করে। কালক্রমে প্রতিনিধির পরিবর্ত্তে বেতন-ভুক্ সৈন্য পোষিত হয় এবং তাহাদিগের তত্ত্বাবধারণার্থ সৈন্যাধ্যক্ষ ও সেনাপতি নিয়োজিত হইয়া থাকে।

যুদ্ধের পর পরাজয়ে দোষীর দোষ সাব্যস্ত হয়। পরাজয় কেবল শারীরিক দুর্ব্বলতার পরিচায়ক নহে, নৈতিক দুর্ব্বলতারও পরিচায়ক। তুমি দোষী না হইলে

যুদ্ধে তুমি পরাস্ত হইবে কেন? বস্তত বর্ব্বর সমাজে ন্যায় অন্যায়ের অন্য অর্থ নাই, অন্য বিচার নাই। তুমি আমার ক্ষতি করিয়াছ, আমি তাহার প্রতিশোধ লইব; পরকালে আর একজন দণ্ড দিবেন, এ সব কূট তার্কিকতা বর্ব্বর হৃদয়ে স্থান পায় না। তুমি আমার ক্ষতি করিয়াছ, আমি তাহা পূরণ করিব। ক্ষতি করিয়াছ কি না তাহার প্রমাণ তোমার জয় পরাজয়। তুমি জয়ী হইলে বুঝিব, ক্ষতি করিতে তোমার অধিকার ছিল, অথবা তুমি ক্ষতি কর নাই অন্যে করিয়াছে, পরাজিত হইলে তুমি দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। পরাজয়-জনিত তোমার কলঙ্ক কখনও আমার ক্ষতি পূরণ করে, কখনও বা তুমি আজীবন আমার দাসত্ব করিয়া তাহার পূরণ কর। কখনও বা অঙ্গের বদলে অঙ্গ, প্রাণের পরিবর্ত্তে প্রাণ লইয়া ক্ষতিপূরণ করা হয়। কখনও বা অঙ্গ বা প্রাণের মূল্য লইয়াও তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি। এই রূপে প্রতিশোধ লইলেই সকল দাবী দাওয়া মিটিয়া যায়, ইহকালে পরকালে আর তুমি আমার নিকট ঋণী রহিলে না। আমার নিকট ভিন্ন আর কাহারও নিকট তোমার জবাব দিহি করিতে হয় না। সমাজ বা সমাজের প্রতিনিধি রাজার নিকট দোষী ব্যক্তি অপরাধী; অপরাধ ব্যক্তিগত নহে, সমাজগত, এ চিন্তা সভ্য-সমাজোচিত। আমার নিকট তুমি দোষ করিয়াছ, আমার সঙ্গে তোমার হিসাব, আমি যে প্রকারে পারি সে হিসাব মিটাইব, অন্যের তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই; আমার সঙ্গে হিসাব মিটিলেই হইল, আমার নিকট অপরাধ করিলে তুমি আর কাহারও নিকট হিসাব দিতে বাধ্য নহ, ইহাই বর্ব্বর সমাজের নিয়ম। ক্রমে এই আমি আমার পরিবারে, পরিবার জাতিতে, জাতি সমাজে পরিণত হয়। তখন আমি তোমাকে ক্ষমা করিলেও সমাজ তোমাকে ছাড়ে না, রাজা তোমাকে দণ্ড দেন। প্রথমে অঙ্গের পরিবর্ত্তে অঙ্গ লইতাম, তাহার পর মূল্য লইতাম, এখন তাহাই জরিমানা রূপে সমাজের প্রতিনিধি রাজার নিকটে দিতে হয়। প্রাচীন দাসত্ব এখন কারাবাসে পরিণত হইয়াছে।

প্রাচীন কালে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে ন্যায়ান্যায়ের বিচার হইত, যে হারিত সেই দোষী বলিয়া গণ্য হইত। দ্বন্দ্ব যুদ্ধের পরিবর্ত্তে সময়-ক্রিয়া, দিব্য, মহা পরীক্ষা বা Ordeal দ্বারাও এক সময়ে সকল দেশে ন্যায় অন্যায় নির্দ্দিষ্ট হইত। বস্তুত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ এক প্রকার সময়-ক্রিয়া মাত্র। প্রথমে প্রবলতা ন্যায়ের পরিচায়ক ও দুর্ব্বলতা অন্যায়ের নিদর্শক বলিয়া গণ্য হইত। এখন ন্যায়ই প্রবলতার এবং অন্যায়ই দুর্ব্বলতার কারণ বলিয়া গণ্য হয়। তুমি দুর্ব্বল হইলেও ন্যায়ের সাহায্যে তুমি বলবানকে পরাস্ত করিতে পার। অপেক্ষাকৃত সভ্যতর সময়েও এই কারণেই ন্যায়ান্যায়ের বিচার দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নিষ্পন্ন হইত। আবার ন্যায় সাহায্যে দুর্ব্বল যদি প্রবলকে পরাভূত করিতে পারে, স্বভাবের নিয়ম বিপর্য্যস্ত করিতে পারে, তবে ন্যায় বলে স্বভাবের অন্যান্য নিয়ম কেন বিপর্য্যস্ত করা যাইবে না? অগ্নিতে দাহ করে, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম, কিন্তু ন্যায়ের সাহায্যে আমি ইহারও ব্যতিক্রম করিতে পারি, ধর্ম্ম কি প্রাকৃত নিয়ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে? এরূপ

যুক্তি এখন আমরা উপেক্ষা করিতে পারি, কিন্তু এক সময়ে অপেক্ষাকৃত সভ্য সমাজেও এই রূপ যুক্তি হেতু সময়-ক্রিয়া বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। সভ্য সমাজে সাক্ষ্য লইয়া বিচার নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু অনেক অপরাধ আছে যাহার সাক্ষ্য মিলে না। সভ্য সমাজে তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দিতে হয়। এক শত জন অপরাধী নিষ্কৃতি পায়, সেও ভাল, এক জন নিরপরাধীর দণ্ড না হয়, ইহা সহৃদয় সভ্য সমাজের নিয়ম। যেখানে সাক্ষ্য মিলিত না, পূর্ব্বে সভ্যতর জাতির মধ্যেও সময়-ক্রিয়া দ্বারা সে সকল মোকদ্দমার বিচার হইত। এ ধন বিশ্বাস ছিল, দেবতা মনুষ্যের প্রত্যেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন, সুতরাং তিনিই দোষী নির্ব্বাচনে সাহায্য করিবেন বলিয়া সকলে আশা করিত। যখন শিক্ষাগুণে রাজ বিচারে সময়-ক্রিয়া উপেক্ষিত হয়—তখনও সাধারণের মন হইতে উহার প্রভাব তিরোহিত হয় না। ইংলণ্ডে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মহা পরীক্ষা রাজ দরবার হইতে দূরীভূত হইয়াছিল, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতেও সাধারণ লোকে সময়-ক্রিয়া দ্বারা ডাকিনী প্রেত্নিনী নির্ণয় করিত। উনবিংশ শতাব্দীতেও ইংলণ্ডে ও ইংলণ্ডের ন্যায় সভ্যতাভিমানী য়ুরোপিয় অন্যান্য দেশে মহা পরীক্ষার নিদর্শন পাওয়া যায়।

অতি প্রাচীন কালে য়িহুদী জাতির মধ্যে কোন রমণীকে ব্যভিচারিণী বলিয়া সন্দেহ করিলে তাহাকে মন্ত্রপূত জল পান করান হইত, গোলড কোষ্টবাসী অসভ্যদিগের মধ্যে এই প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। টাসিটাস বলেন, পূর্ব্বে জর্ম্মণদিগের মধ্যে মহা-পরীক্ষা বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। সাক্সন জাতি অগ্নি পরীক্ষা বা জল পরীক্ষা দ্বারা দোষী নির্দ্দোষী নির্ণয় করিত। অগ্নি-পরীক্ষা উচ্চ শ্রেণীতে (Free men) এবং জল পরীক্ষা নিম্ন শ্রেণীতে (Villain) আবদ্ধ ছিল। দোষী ব্যক্তি পরীক্ষা দিবার জন্য আবশ্যক হইলে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারিত, কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল তাহাকেই ভোগ করিতে হইত। কিছু পয়সা পাইয়া বা বন্ধুতা করিয়া প্রতিনিধি পরীক্ষা দিবার জন্য কিছু শারীরিক কষ্ট মাত্র সহ্য করিত। অগ্নি পরীক্ষার দুইটী প্রণালী ছিল। আধ সের একসের বা দেড়সের অগ্নি-প্রায় উত্তপ্ত লৌহ হাতে তুলিয়া লইলে যদি হাতে কোন ক্ষত না হইত, অথবা অগ্নিপ্রায় উত্তপ্ত নয় খানি লাঙ্গলের অর দূরে দূরে লম্ব ভাবে সাজাইয়া চোখে কাপড় বাঁধিয়া রিক্ত পদে তাহাদের উপর দিয়া চলিয়া যাইলে পায়ে যদি কোন ক্ষত না হইত, তবে পরীক্ষিত ব্যক্তি নির্দ্দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। ইংলণ্ডের রাজা এডওয়ার্ড কনফেসারের জননী রাণী এমা বিশপ আরুইনের সহিত ব্যভিচার করিয়াছে বলিয়া লোকে সন্দেহ করিলে রাজার মাতা এই দ্বিতীয় প্রণালীতে অগ্নি পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় বিলিয়মের রাজত্ব কালে হরিণ চুরী অপরাধে পঞ্চাশ জন লোককে অগ্নি দ্বারা পরীক্ষা করা হইয়াছিল। অগ্নি পরীক্ষার ন্যায় জল পরীক্ষাও দুই প্রকার ছিল। কেহ উত্তপ্ত জলে হাত ডুবাইয়া হাতে ক্ষত না হইলে নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হইত। কাহাকেও বা পুকুরে বা নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হইত। সাঁতার না দিয়া সে ব্যক্তি জলের উপর ভাসিয়া উঠিলে তাহাকে দোষী বলিয়া দণ্ড

দেওয়া হইত, জলে ডুবিয়া যাইলে নির্দ্দোষিতার সন্দেহ থাকিত না। আর্‌ল গডবিন রাজা এডবার্ডের ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া সন্দেহ হইলে আধ ছটাক ওজনের এক খণ্ড মন্ত্রপূত রুটী তাঁহাকে খাইবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল। রুটীখানি না চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিতে হইত। রুটীখানি গলায় বাধিয়া গডবিনের মৃত্যু হয়—সুতরাং তিনিই যে প্রকৃত অপরাধী, সে বিষয়ে কাহারই আর সন্দেহ ছিল না। খাইবার সময় যদি শরীর কাঁপিত বা মুখ বিবর্ণ হইত, তাহা হইলেও তাঁহাকে দোষী বলিয়া স্থির করা হইত। নর্ম্মানেরা ইংলণ্ড অধিকার করিবার পর দোষী নির্দ্দোষী বা অপরাধী ও অনধিকারী দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নির্ণয় করিবার প্রথা আরম্ভ হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন হতদেহ স্পর্শ করিয়াও নির্দ্দোষীতা প্রমাণ করিবার উপায় ছিল—হত্যাকারী হতদেহ স্পর্শ করিলে তাহা হইতে রক্তস্রাব হইত। ফরাসী দেশে ক্রুশের সম্মুখে প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে দাড় করাইয়া রাখা হইত। যে আগে পড়িয়া যাইত, সেই দোষী বলিয়া স্থির হইত। এদেশে পাশা ফেলিয়াও দোষী নির্দ্দোষী ঠিক করা হইত।

সভ্যতাভিমানী গ্রীস দেশেও সভ্যাসভ্য সকল দেশের ন্যায় সময়-ক্রিয়া প্রচলিত ছিল। বিদ্রোহাপবাদে লোকে তপ্ত লৌহ হাতে লইয়া বা আগুণের উপর দিয়া চলিয়া যাইয়া আপন আপন নির্দ্দোষীতা প্রতিপন্ন করিত। থিসিলিয়া, সার্ডিনিয়া প্রভৃতি যুরোপীয় অনেক প্রদেশে জল পরীক্ষার নিদর্শন পাওয়া যায়। শ্যাম দেশে অগ্নি পরীক্ষা, জল পরীক্ষা বা ব্যাঘ্রের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিয়া নির্দ্দোষিতা প্রতিপাদন করিতে হইত।

লিবিংষ্টোন্ সাহেব দেখিয়াছেন, আফ্রিকা মহাদেশে কোন পত্নী ঔষধ করিয়াছে বলিয়া কেহ সন্দেহ করিলে ওঝা ডাকাইয়া পত্নীগণকে মাঠে লইয়া যায় এবং উপবাস করাইয়া রাখে। অবশেষে ওঝা এক প্রকার গাছের রস সকলকে খাওয়াইয়া দেয়। রস খাইয়া সকলে ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সে রস খাইয়া যাহারা বমন করে তাহারা নির্দ্দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু যাহাদের উদরাময় হয় তাহাদিগকে ডাকিনী বলিয়া জলন্ত অনলে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। জাম্বেজী তটবাসী নিগ্রোদিগের মধ্যে সময়-ক্রিয়ার বহুল প্রাদুর্ভাব। অতি সামান্য কলহে রমণীরা সময়-ক্রিয়া দ্বারা নির্দ্দোষীতা প্রতিপন্ন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। বাকশী জাতি কুকুর বা কুক্কুটকে বৃক্ষ-নির্য্যাস খাওয়াইয়া দোষাদোষের বিচার করে। বমনে নির্দ্দোষ ও উদরাময়ে দোষের প্রমাণ হয়।

ভারতবর্ষে কতদিন সময়-ক্রিয়া প্রচলিত আছে, হিসাব করিয়া বলা য[illegible]। যে অলিখিত ইতিবৃত্ত দীর্ঘায়তন লাভ করিয়া পুরাণ আখ্যায়িকা রূপে দর্শন দেয়, তাহার মধ্যে সময়-ক্রিয়ার বিবিধ উদাহরণ পাওয়া যায়। ব্যভিচার সন্দেহে সীতার অগ্নি পরীক্ষার কথা সকলেই অবগত আছেন। মনুসংহিতায় বৎসঋষি অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। ভারতবর্ষীয় অনার্য্য জাতির মধ্যে এই প্রথার অদ্যাপি অক্ষত প্রাদুর্ভাব।

গারো পর্ব্বতবাসীদিগের মধ্যে মোকদ্দমা আদৌ হয় না। তাহারা স্বীয় পদ্ধতি অনুসারে সকল গোলযোগ মিটাইয়া লয়।

কেহ কাহার নিকট টাকার দাবী করিলে তাহারা একটা নূতন হাঁড়ি ভরিয়া আগুণ করিয়া আগুণের উপর জল রাখে, সেই জল নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ফুটিলে টাকার দায়ী হইতে হয় না ; তবে যে মিথ্যা দাবী করে, তাহার অর্থ দণ্ড হয়।

আর্য্যসমাজে অতি প্রাচীন কাল হইতে নয় প্রকার দিব্য বা শপথ-ক্রিয়া প্রচলিত ছিল। বৃহস্পতি বলেন ;—

"ধটোঽগ্নিরুদকঞ্চৈব বিষংকোষশ্চপঞ্চমং-ষষ্ঠঞ্চ তণ্ডুলা প্রোক্তাঃ সপ্তমংতপ্ত মাষকং। অষ্টমংফাল মিত্যুক্তং নবমং ধর্ম্মজং স্মৃতিং। দিব্যান্তেতানি সর্ব্বানি নির্দ্দিষ্টানি স্বয়ম্ভুবা।"

বিষ্ণু ধট অগ্নি উদক বিষ ও কোষ, এই পাঁচ প্রকার শপথ-ক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয় অপর চারিটী এবং তিল দূর্ব্বাদি অন্যান্য আরো অনেকগুলি সামান্য বা অগোরব বলিয়া তিনি তাহাদিগের উল্লেখ করেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন ;—

"তুলাগ্ন্যাপোবিষং কোষাদিব্যানীহবিশুদ্ধয়ে মহ [illegible] ভিযোক্তরি।"

কাত্যায়ন সপ্তবিধ দিব্যের উল্লেখ করিয়াছেন ;—

"বিষে তোয়েহুতাশেচ তুলা কোষে চ তণ্ডুলে তপ্ত মাষক দিব্যে চ ক্রমাদ্দণ্ডং প্রকল্পয়েৎ।"

ধট বা তুলা পরীক্ষার প্রক্রিয়া এইরূপ ;— চারি হস্ত উচ্চ দুটি খুঁটির উপর খদির বা তিন্দুক কাষ্ঠের পাঁচ হাত লম্বা পতাকাধ্বজ শোভিত তুলাদণ্ড বসাইয়া তাহার দুই পার্শ্বে লৌহ বলয়ে সমান লম্বা দুইটী শিকা ঝুলাইয়া একটীতে অপরাধীকে বসাইয়া ওজন করিয়া লইবে। তাহার পর তাহাকে নামাইয়া প্রাড়্‌বিবাক ধট ও পরীক্ষকদিগকে এইরূপে সম্বোধন করিবেন ;—

"ব্রহ্মঘ্নাং যে স্মৃতা লোকাঃ যে লোকাঃ কূট-সাক্ষিণাং
তুলাধারস্য তে লোকা তুলাং ধারয়তো মৃষা।
ধর্ম্মপর্য্যায় বচনৈর্ধ ট ইত্যাভিধীয়সে
ত্বমেব ধট জানীষে ন বিদুর্য্যানি মানুষাঃ।
ব্যবহারাভিশস্তোঽয়ং মানুষস্তুল্যতে ত্বয়ি
তদেনং সংশয়াদস্মাদ্দর্ম্ম তত্রা তুমর্হসি।"

বিষ্ণু অপরাধী তখন এই বলিয়া ধটকে সম্বোধন করিবে ;—

ত্বং তুলে সত্যধামাসি পুরাদেবৈর্বিনির্ম্মিতা
তৎসত্যং বদ কল্যাণি সংশয়স্মাং বিমোচয়
যদ্যস্মি পাপ কৃম্মতে স্ততোমাং ত্বং অধোনয়
শুদ্ধশ্চেদ্গময়োর্দ্ধাং মাং তুলামিত্যভিমন্ত্রয়েৎ

তদনন্তর পুনর্ব্বার অপরাধীকে তুলাদণ্ডে বসাইয়া ওজন করিবে। যদি অপরাধী পূর্ব্বাপেক্ষা লঘুতর হয়, তাহাকে শুদ্ধ বলিয়া জানিবে, পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর হইলে দোষী জানিয়া দণ্ড দিবে। এখানে একটী কথা বলিতে ইচ্ছা হয়। ভারতবর্ষে লঘুতর নির্দ্দোষীতার প্রমাণ। গ্রীসদেশেও লঘুতা নির্দ্দোষীতার প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু ইংলণ্ডে লঘুতা দোষের প্রমাণ। ইদ-নোদ্যানে আদি পুরুষকে পাপ পথে প্রবৃত্ত করিবার সময় শয়তান ধরা পড়িলে গাব্রেলের সহিত বিবাদ হইবার উপক্রম হয়। সহসা আকাশ পথে একটী তুলাদণ্ডের আবির্ভাব হইল। সে দণ্ডের এক পার্শ্বে গাব্রেলের প্রতি-মূর্ত্তি অবস্থিত, তুলাদণ্ডে আপনাকে লঘুতর পরিমিত হইতে দেখিয়া শয়তান রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছিল। যথা—

"Now dreadful deeds
Might have ensued...had not soon
The Eternal to prevent such hurrid fray
Hurry forth in heaven his golden scales.

In these he put two weights,
The sequel each of parting and fight:
The latter quick up flew and kicked the beam
The fiend looked up and knew
His mounted scale aloft : nor are but fled" *Milton.*

অগ্নি পরীক্ষাঃ—

ষোড়শাঙ্গুলং তাবদন্তরং মণ্ডলংসপ্তকং কুর্য্যাৎ। ততঃ প্রাঙ্মুখস্য প্রসারিত ভুজ-দ্বয়স্য সপ্তাশ্বথ পত্রাণি করয়োর্দদ্যাৎ। তানি চ করদ্বয় সহিতানি সূত্রেণ বেষ্টয়েৎ। ততস্তত্রাগ্নি বর্ণ লোহ পিণ্ডং পঞ্চাশ পলিকং সমং ন্যসেৎ। তমাদায় নাতিক্রতংনাতি বিলম্বিতং মণ্ডলেষু পদন্যাসং কুর্ব্বন ব্রজেৎ। ততঃ সপ্তমং মণ্ডল মতীত্য ভূমৌ লোহ পিণ্ডং জহ্যাৎ।

যো হস্তয়োঃ কচিদ্দগ্ধ স্তমশুদ্ধং বিনির্দিশেৎ
ন দগ্ধঃ সর্ব্বথা যস্ত স বিশুদ্ধো ভবেন্নরঃ॥ বিষ্ণু

ষোড়শাঙ্গুল ব্যাস পরিমিত সাতটী বৃত্ত সমদূরে অঙ্কিত করিবে। ও অভিশস্তকে পূর্ব্ব মুখে বসাইয়া হাত বিস্তৃত করিয়া দুই হাতের ভিতর সাতটী অশ্বত্থ পত্র রাখিয়া সূতা দিয়া হাত জড়াইয়া পঞ্চাশ পলিক ভার অগ্নিপ্রায় লৌহ পিণ্ডে রাখিবে। সেই পিণ্ড লইয়া অভিশস্ত ধীরে ধীরে সেই সাতটী বৃত্তে পদক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাইবে, এবং সপ্তম বৃত্ত অতিক্রম করিয়া লোহপিণ্ড মাটীতে রাখিয়া দিবে। যাহার হাত কিছু মাত্র দগ্ধ হইবে, সে দোষী, অন্যথা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।

লৌহপিণ্ড গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে অভিশস্ত ব্যক্তি অগ্নিকে এই বলিয়া সম্বোধন করিবে;—

ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবক
সাক্ষিবৎ পুণ্যপাপেভ্যো ব্রূহি সত্যংকবেমম।
যাজ্ঞবল্ক্য।

উদক পরীক্ষা—পঙ্ক শৈবাল দুষ্টগ্রাহ মৎস্য জলৌকাদি বর্জিত জলাশয়কে এই বলিয়া সম্বোধন করিবে;—

ত্বমম্ভঃ সর্ব্বভূতানা মন্ত শ্চরসি সাক্ষিবৎ
ত্বমে বা স্তো বিজানীষে ন বিদুর্যানি মানুষাঃ।
ব্যবহারাভি শস্তোঽয়ং মানুষস্তস্মি মজ্জতি
তদেনং সংশয়া দস্মাদ্ধর্ম্মতস্ত্রাতু মর্হসি।

তদন্তর অভিশস্ত ব্যক্তি রাগদ্বেষ বর্জ্জিত কোন পুরুষের জানুদ্বয় ধারণ করিয়া "সত্যেন মাভিরক্ষস্ব বরুণ" বলিয়া জলে ডুবিয়া থাকিবে। সেই সময় একজন নাতি ক্রুর মৃদু ধনু দ্বারা (সাত শত অঙ্গুলি পরিমাণ ধনু ক্রূর পঞ্চাশৎ পরিমাণে মৃদু) একটী তীর নিক্ষেপ করিবে, অন্য একজন দ্রুত যাইয়া সেইটী কুড়াইয়া আনিবে।

তন্মধ্যে যো ন দৃশ্যতে স শুদ্ধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ
অন্যথা হ্ব বিশুদ্ধঃ স্যাদে কাঙ্গস্যাপি দর্শনে।

বিষ পরীক্ষা;—

বিষত্বদ্বিষ মন্বাচ্চ ক্রূরং ত্বং সর্ব্বদেহিনাম
ত্বমেব বিষজানীষে ন বিদুর্যানি মানুষাঃ।
ব্যবহারাভি সন্তোঽয়ং মানুষঃ শুদ্ধি মিচ্ছতি
তদেনং সংশয়াদস্মাদ্ধর্ম্ম তস্ত্রাতু মর্হসি।

এই বলিয়া হিমাচলোদ্ভব শৃঙ্গি বৃক্ষজাত সাতযব বিষ ঘৃত প্লুত করিয়া অভিশস্ত ব্যক্তিকে খাইতে দিবে। অভিশস্ত এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে;—

ত্ব বিষ ব্রাহ্মণঃ পুত্রঃ সত্য ধর্ম্মে ব্যবস্থিত
ত্রায়স্বাস্মাদভিশাপাৎ সত্যেন ভবমেঽমৃতঃ

বেগ বিনা যে সে বিষ জীর্ণ করিতে পারিবে, তাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া জানিবে।

কোষ পরীক্ষা;—

দুর্গাদি উগ্রদেবতাদিগকে অর্চনা করিয়া তাঁহাদিগের স্নান পূত তিন প্রসৃতি জল পান করিবে। দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে

যদি রোগ অগ্নি জ্ঞাতি মরণ রাজাতঙ্ক প্রভৃতি কোন ব্যসন না ঘটে তবে অভিশপ্ত ব্যক্তি নির্দ্দোষী বলিয়া জানিবে।

চুর্ণয়াবাপয়ে জ্বলং যাদিতাঙ্ক চ মণ্ডলং
অন্ত্বেষামপি দেবানাং স্থাপয়ে দাযুপানি চ।

কাত্যায়ন।

তণ্ডুল পরীক্ষাঃ—আদিত্য স্নান পূত জল ও চাউল একটী মৃন্ময় পাত্রে এক রাত্রি রাখিয়া চৌর্য্যাভিশপ্ত ব্যক্তিকে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া তাহার শিরোপরি একখানি পত্র রাখিবে। পত্রে এই কথাটী লেখা থাকিবে;—

আদিত্য চন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ
দ্যৌর্ভূমি রাপো হৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিচ উভেচ সন্ধ্যে
ধর্ম্মোহি জানাতি নরস্য বৃত্তং।

তদনন্তর তাহাকে ঐ তণ্ডুল ভক্ষণ করাইয়া ভূর্জ্জ বা পিপ্পল পত্রে তিন বার নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করাইবে। শোনিত দৃষ্ট হইলে, হনুতালু বা গাত্র কম্পন হইলে তাহাকে অপরাধী বলিয়া জানিবে।

চাল পড়া খাওয়ান ভারতবর্ষেও অদ্যাপি বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। হণ্টার সাহেব বলেন, ভারতবর্ষীয় নানা অনার্য্য জাতির মধ্যেও এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। চট্টগ্রামের চুকমা জাতির কথা বলিতে বলিতে তিনি বলিয়াছেন "গুরুতর অপরাধে কেহ অভিশপ্ত হইলে একটী মৃন্ময় পাত্রে একসের চাউল রাখিয়া পাত্রটী কোন মন্দিরে গৌতমের প্রতিমূর্ত্তি সমক্ষে রাত্রিকালে রাখিয়া দেওয়া হয়। প্রভাতে রাওলেরা অভিশপ্ত ব্যক্তিকে তাহার কিছু চিবাইতে দেয়। অপরাধী হইলে চাল চিবান দুষ্কর হইয়া পড়ে এবং তাহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে থাকে।

"With slight modification, this form of ordeal prevails in every part of India.

*Hunter's Statistical Reports.*

তপ্তমাষকঃ—ষোড়শাঙ্গুল দীর্ঘ চতুরঙ্গুল খাত মৃন্ময় তাম্র বা আয়স পাত্র বিংশতি পল পরিমাণ উত্তপ্ত-ঘৃত বা তৈল দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে স্বর্ণ মাষক নিক্ষেপ করিবে। অভিশপ্ত ব্যক্তি অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি যোগে তাহা উদ্ধার করিবে। করাগ্রে যদি ক্ষত বা বিস্ফোট না হয় তাহাকে শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। বিচারক ঘৃতকে এই বলিয়া আহ্বান করিবেনঃ—

পরং পবিত্রমমৃতং ঘৃত ত্বং যজ্ঞ কর্ম্মসু
দহ পাবক পাপং ত্বং হিম শীতঃ শুচৌভব।

অভিশপ্ত এই মন্ত্রটী পাঠ করিবেন

ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্ত শ্চরসি পাবক
সাক্ষিবৎপুণ্য পাপেভ্যো ব্রূহি সত্ কবে মম

ফাল পরীক্ষাঃ—

গো-চোরদিগের পক্ষে ফাল পরীক্ষা বিধেয়। দ্বাদশ পল আয়সে অষ্টাঙ্গুল দীর্ঘ ও চতুরঙ্গুল বিস্তার ফাল প্রস্তুত করিয়া তাহা উত্তাপে অগ্নিবর্ণ করিবে। তদনন্তর নিম্ন লিখিত মন্ত্রে অগ্নিকে আরাধনা করিয়া চোরকে সেই ফাল জিহ্বা দ্বারা লেহন করিতে বলিবে। জিহ্বা দগ্ধ না হইলে সে নির্দ্দোষী।

ত্বমগ্নে বেদাশ্চত্বারস্তঞ্চ যজ্ঞেষু হূয়সে
ত্বং মুখং সর্ব্বদেবানাংত্বং মুখং ব্রহ্মবাদিনাং
জঠরস্থোঽসি ভূতানাংততো বেৎসি শুভাশুভ
পাপংপুনাসি বৈ যস্মাত্তস্মাৎ পাবকউচ্যতে
পাপেষু দর্শয়াত্মানমর্চিষ্মান ভব পাবক
অথবা শুভ ভাবেন শীতোভব হুতাশন।
ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি সাক্ষীবৎ
ত্বমেব দেব জানীষে ন বিদুর্য্যানি মানবাঃ

কন্দরে বা গহন কাননে প্রবেশ করেন ; এবং বোধ হয় সেই অবধিই সাধারণ লোক সকল আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি ঈদৃশ আস্থাশূন্য হইয়া সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধিতেই অভিনিবিষ্ট-চিত্ত হইয়া পড়ে। আমাদের অনুমিত কারণে ভ্রম প্রমাদ থাকিতে পারে, কিন্তু বিগত কয়েক শতাব্দীতে বাস্তবিকই যে আমরা আধ্যাত্মিকতা হারাইয়াছিলাম, তদ্বিষয়ে কেহই সন্দেহ করিতে পারেন না। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় স্বকীয় প্রভূত জ্ঞান ও সুতীক্ষ্ণ বিচার শক্তির সাহায্যে আবার সেই প্রাচীনতম ভারতের প্রিয়তম একেশ্বরবাদ প্রচারিত করেন। নানা বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া তাঁহার প্রচারিত মুনি ঋষিদিগের আবিষ্কৃত সুমার্জ্জিত ধর্ম্মমত ধীরে ধীরে ভারতবাসীর হৃদয়ে স্থান পাইতেছে। কিন্তু এক্ষণে আবার এক নূতনবিধ অন্তরায় উপস্থিত। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক দল লোক আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা (কি উদ্দেশ্যে বলিতে চাহি না) জাতিকে পুনরায় মধ্যকালীন অন্ধকারের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া জড় সাকার দেব দেবীর মূর্ত্তি পূজা করাইতে চাহেন। আমরা এক্ষণে বড় সঙ্কটাপন্ন স্থলে উপস্থিত। এক দিকে বর্ত্তমান শিক্ষা, কালের গতি ও মার্জ্জিত জ্ঞান নিরাকার একেশ্বরবাদের দিকে ক্রমশ আকর্ষণ করিতেছে। অপর দিকে হিন্দু দার্শনিক পণ্ডিতগণ তর্কজাল বিস্তার করিয়া ও হিন্দুশাস্ত্রের অনাদিকাল-সঞ্চিত সাগরোপম গর্ত্ত হইতে উপযোগী রচনাবলী উদ্ধার করিয়া জাতিকে পৌত্তলিকতা ও মূর্ত্তিপূজার দিকে অগ্রসর করিতে চাহিতেছেন। জন সমাজ কোন্ দিকে যায়? এখন শাস্ত্র ভাবে এ বিষয়ের বিস্তর আলোচনা হওয়া আবশ্যক। জন সাধারণের সমক্ষে, এই উভয় পক্ষের মত পরিষ্কার রূপে বিচারিত হইয়া গেলে, তাঁহারা যে পথ ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত মনে করিবেন, তাহাই অবলম্বন করিতে সমর্থ হইবেন।

এক পক্ষের পণ্ডিতগণ আপনাদের মত বিবিধ বিধানে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। অপর পক্ষের মধ্যে বিগত জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের নব্যভারতে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত বাবু দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় "পৌত্তলিক কে?" নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে তাঁহার অভিমত কিয়ৎ পরিমাণে ব্যক্ত করিয়াছেন। তথায় তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, "সে প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা কোন ধর্ম্মের কিছু আসে যায় না," অর্থাৎ তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য না করিয়া সাধারণ ভাবে পৌত্তলিকতা কি, তাহা বুঝাইতে যত্ন করিয়াছেন, তথাপি অনেকে তাঁহার অভিপ্রায় হয়ত বুঝিতে না পারিয়া নানাবিধ আশঙ্কা করিতেছেন। কেহ মনে করিয়াছেন, তিনি আমাদের দেশের পৌত্তলিকদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, কোন২ লোক মনে করিতেছেন, এইরূপে একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মগণও ক্রমে পৌত্তলিক হইয়া পড়িবে!! সে যাহা হউক, এ বিষয়ে আরও আন্দোলন হওয়া আবশ্যক মনে করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতে অগ্রসর হইতেছি। আমরা ক্ষমতা প্রযুক্ত বিশ্বাস করি না যে, কিছু বিশেষ কথা বলিতে পারিব। তথাপি কয়েকটী কথা, যাহা বলিবার আছে, তাহা লইয়া সমাজে আলোচনা হয়, এই অভিপ্রায়ে সেই কয়টী কথা প্রকাশ করি। কিন্তু এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, যদিও দ্বিজদাস বাবুর প্রবন্ধ অবলম্বনে ইহা

লিখিত হইল তথাপি ইহা তাঁহার প্রবন্ধের সম্পূর্ণ প্রতিবাদ নহে। প্রতিবাদ করিতে গেলে বিস্তর লিখিতে হয়। আমাদের বক্তব্য কয়েকটী কথামাত্র প্রকাশ করাই ইহার উদ্দেশ্য।

প্রথম প্রশ্ন—পৌত্তলিকতা কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া দ্বিজদাস বাবু বড় গোলে পড়িয়াছেন। তিনি এক জাতীয় পৌত্তলিক দেখিলেন, যাহারা স্বষ্ট কোন বস্তু বা জীবে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া পূজা করে। তাহাদিগের আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাহাদের পৌত্তলিকতার মূলে ঈশ্বর জ্ঞানের পূর্ণ বা আংশিক অভাব আছে, তদ্ভিন্ন অন্য দোষ নাই। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিলেন যে, তাহাদিগের উক্ত অভাবের জন্য তাহাদিগকে পৌত্তলিক বলিতে গেলে "অনাস্তিক মাত্রেই পৌত্তলিক" হইয়া পড়ে। তবে আর অপৌত্তলিক কে?—কেহই নয়, কেন না কাহারই ঈশ্বর জ্ঞান পূর্ণ নহে, অভাব আছেই আছে। কাজেই তাহাদিগকে আর পৌত্তলিক বলা হইল না। পরে আর এক শ্রেণীর পৌত্তলিক দেখিলেন, তাঁহারা উপাস্য দেব মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বলেন না, কেবল ঈশ্বরের স্মরণ মনন ধ্যান ধারণার সৌকর্য্যার্থে চিহ্ন স্বরূপ মনে করেন। দ্বিজদাস বাবু ইহাদিগকেও পৌত্তলিক বলিতে পারিলেন না, কেন না তাহা হইলেও তাঁহার মতে ব্রাহ্ম ও অন্যান্য একেশ্বরবাদীরাও ঐ শ্রেণী ভুক্ত হইয়া পড়েন, কারণ তিনি বলেন, সকলেই কোন না কোন চিহ্ন অবলম্বনে ঈশ্বর চিন্তা করিয়া থাকেন। শব্দ বা অন্য কোন চিহ্ন ধরিয়া যদি পৌত্তলিক নয়, তবে মূর্ত্তিচিহ্নধারীগণ পৌত্তলিক নামে কি হিসাবে অভিহিত হইতে পারেন? এ সম্বন্ধে আমাদের মত উপযুক্ত স্থলে ব্যক্ত হইবে। তৎপরে আর পৌত্তলিক পদবাচ্য কোন সম্প্রদায় দেখিতে না পাইয়া তিনি কপটাচারীদিগকেই ঐ নাম দিয়াছেন। তিনি বলেন "কপটতাই পৌত্তলিকতা।......ভণ্ডই পৌত্তলিক, যেহেতু ভণ্ড শব্দে অথবা মূর্ত্ত পুত্তলের লক্ষ্য দেবতাকে উদ্দেশ না করিয়া কার্য্য করে।...... তাহারই দেবতা প্রকৃতপক্ষে জড় পুত্তল, অতএব সেই প্রকৃত পৌত্তলিক।" সুযোগ্য লেখক এই স্থলে নিজেরই কথায় নিজে জড়িত হইয়াছেন। ভ্রাতৃবর এখানে বিস্মৃত হইয়াছেন যে, ভণ্ড ও তাঁহার প্রথম ও চতুর্থ শ্রেণীর পৌত্তলিকদিগের মধ্যে পড়িয়াছে। কেন না তাহারও প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই, তাহা হইলে সে কখন এরূপ ভণ্ডামি করিতে পারিত না। সুতরাং তাহার যে কপটতা দোষ, উহারও মূলদেশে প্রকৃত জ্ঞানের অবিদ্যমানতাই লক্ষিত হয়। বোধ হয়, শ্রদ্ধেয় দ্বিজদাস বাবুও মনে করেন না যে, প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান যাহার আছে সে কখন প্রাণান্তেও এতাদৃশ কপটতাচরণ করিতে পারে! তবে আর ভণ্ড কপটও পৌত্তলিক কৈ? যদি বলেন, ব্রহ্মজ্ঞান কিয়ৎপরিমাণে হইলেও ত তদুপাসনায় সরলতা না আসিতে পারে, সে কথা তাঁহার ১ম ও ৪র্থ শ্রেণীর লোকদিগের প্রতিও খাটিতে পারে। সুতরাং তাঁহার কথানুসারেই কপটাচারী পৌত্তলিক হইল না। তবে "পৌত্তলিক কে?" এ প্রশ্ন তাঁহার প্রবন্ধে মীমাংসা হইল কৈ? তাহার পরই বলিয়াছেন, "তোমার আমার পরস্পরকে পৌত্ত-

লিক বলিয়া নিন্দা করা বিড়ম্বনা মাত্র।” কেন না “প্রকৃত ব্রহ্মদর্শন যাহার লাভ হয় নাই, সেই পৌত্তলিক। সে অর্থে হয়ত তুমিও পৌত্তলিক, আমিও পৌত্তলিক।” এবিষয়ে আমাদের আরও বলিবার কথা আছে।

তবে পৌত্তলিকতা কি? এপ্রশ্নের মীমাংসা করা একদিকে যেমন সহজ, আর এক দিকে আবার তেমনি কঠিন। প্রত্যেক নাগরিক, প্রতি বিদ্যালয়ের উন্নত শ্রেণীর ছাত্রই অতি সহজে এপ্রশ্নের এক প্রকার উত্তর দিতে সমর্থ। আবার সুযোগ্য লেখকগণও ইহার রীতিমত ব্যাখ্যা করিয়া নির্দ্দোষ লক্ষণ বলিতে পারেন না। সহজ জ্ঞানের ও সাধারণ দৃষ্টির অর্থ সহজ কিন্তু দার্শনিক ব্যাখ্যা দ্বারা লক্ষণ স্থির করিয়া কোন আখ্যা প্রদান করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কার্য্য। এই কঠিনতা প্রযুক্তই সম্মানিত দ্বিজদাস বাবু শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি অতি উন্নত লক্ষ্য ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া উদার উন্নত চক্ষে কথাটীর প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাহার লক্ষণ দিতে গিয়া দেখেন, সব গোলযোগ। বাস্তবিকও তাহা অপরিহার্য্য। এমন কি, তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়েরও ঐরূপ দার্শনিক আখ্যা দেওয়া অসম্ভব। মনে করুন, জড়, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণী, এই তিন জাতীয় পদার্থ দ্বারা প্রকৃতি পূর্ণ এবং ইহাদের ন্যায় সর্ব্ববাদিসম্মত বিভিন্ন বস্তু আর কি হইতে পারে? কিন্তু ইহাদেরও মধ্যে এমন সকল স্থল আছে, যেখানে সৃষ্ট পদার্থটী জড়, কি উদ্ভিদ, কি প্রাণী, কিছুই মীমাংসা করা অসম্ভব। এমন প্রাণী আছে, যাহাকে মহা মহা পণ্ডিতেরা আবার উদ্ভিজ্জ শ্রেণীবদ্ধ করেন, এমন উদ্ভিদ আছে যাহারা উদ্ভিদ্ কি জড়, তাহার স্থিরতা অদ্যাপি হয় নাই। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন Line of demarcation প্রভেদ সূচক চিহ্নিত রেখা দেখা যায় না। তবেই দেখুন, এমন সব সহজ বিষয়েরই যদি প্রকৃত দর্শন সম্মত লক্ষণ ধার্য্য হইল না, তবে আর পৌত্তলিকতা প্রভৃতি কঠিন ভাবগত-প্রাণ বিষয়ের সূক্ষ্ম মীমাংসা কি হইবে? এ সকল বিষয়ে সাধারণে ব্যাখ্যাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

আর ধর্ম্মজগতের ইতিবৃত্ত যত টুকু বুঝা যায়, তাহাতেও ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এখানেও ক্রমোন্নতি দেখা যাইতেছে। মনে করুন এই যে একেশ্বরবাদ, ইহা কি একেবারে মানব সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল? কেহই তা মনে করেন না। সকল দেশের সকল জাতিরই প্রাচীন ধর্ম্ম বিবরণ দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, মানব প্রথমাবস্থায় প্রকৃতির উপাসক ছিলেন। সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার কোন দেব দেবী বা মূর্ত্তি বিশিষ্ট পুরুষ প্রকৃতি ছিল না, কোন কল্পিত দেবতার উপাসনা করিতে তখনও তিনি শিক্ষা করেন নাই। প্রাতঃকালে প্রতিদিন সূর্য্য দেব পূর্ব্বাকাশ আলোকিত করিয়া জগৎকে হাসাইয়া দেখা দেন, রাত্রে কেমন হাস্যময়ী পূর্ণিমার পবিত্র বিমল জ্যোৎস্না, গ্রীষ্মাতিশয্যের প্রদোষ কালে সুস্নিগ্ধ মলয় পবন, আবার শীতের কঠোরতার মধ্যে কাষ্ঠনিঃসৃত লোলজিহ্বা উত্তপ্ত অগ্নি শিখা; গগনস্পর্শী ভীষণ দর্শন দিগন্তব্যাপী পর্ব্বতমালা, তদ্দেহ নিঃসৃত কলনাদী সুশীতল প্রস্রবণ; আকাশ-বিহারী শ্বেত কৃষ্ণ ধূসরাদি বিবিধ বর্ণে পরিবর্ত্তনশীল দুরন্ত মেঘমালা, তাহা-

দের ভীষণ নিনাদ ও বর্ষিত অজস্র বারিধারা; নানাবিধ শস্যের অক্ষয় ভাণ্ডার স্বরূপ উর্ব্বরা পৃথিবী ও তদুপরিস্থিত ফুলফল সুশোভিত সুরম্য বিটপী শ্রেণী—সমস্ত প্রকৃতিই তখন নবাগত মানবের কৌতূহল পূর্ণ মানসকে আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি কাহাকে ভয় করিতেন, কাহাকেও বা আত্ম সুখ লাভের আশায় প্রার্থনা করিতেন, কাহারও সহিত মনের কথা খুলিয়া বলিতেন, কাহাকে অবলম্বন করিয়া তাহার সাহায্যতায় নিজের অশেষ কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইতেন। এইরূপেই তখনকার মানব পশুপক্ষীদের ভাষা বুঝিতেন ও তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিতেন। তিনি নিজের মধ্যে যেমন প্রাণ দেখিলেন, বুদ্ধি দেখিলেন, অন্য সকল বস্তুতেই প্রথমে তাহাই অনুমান করিয়া লইলেন। সমস্ত প্রকৃতি তাঁহার চক্ষে তখন জীবন্ত জাগ্রত অগণ্য দেবতা পরিপূর্ণ। সকল জাতিরই প্রাচীনতম কথাবলি এই ভাবের সাক্ষ্য প্রদান করে।

ক্রমে এ ভ্রম চলিয়া গেল। ক্রমে মানব পরীক্ষায় দেখিলেন যে, প্রকৃতির বস্তু সকলের মধ্যে তাঁহার নিজের মত জীবন বা আত্মা নাই। ক্রমে প্রকৃতি নির্জ্জীববৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। পর্ব্বতের স্তোত্র পাঠ করেন পর্ব্বত নিরুত্তর। নদীকে সম্বোধন করিয়া প্রাচীন কবি কত কি প্রাণের গভীর উচ্ছাস প্রকাশ করেন, নদী স্থির গম্ভীর ভাবে নিজ পথেই অবিরল ধায়মানা। উদ্ভিদগণকে কত সমাদর করেন, কত কথা সম্ভাষণ করেন, কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর পান না। তখন ক্রমে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নির্জ্জীব হইলে কি হয়? চেতনা শূন্য হইলে কি হয়? যে শক্তির পরিচয় মানব নিজ প্রাণে পাইতেছেন, যে শক্তি ইচ্ছা রূপে নিজের অভ্যন্তরে নিয়ত বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার সমস্ত কার্য্যের প্রণোদন করিতেছে, যে শক্তির পরিচয় পাইয়া মানব নিজকে চেতন, জীবন্ত, আত্মা বা ইচ্ছাবিশিষ্ট জীব মনে করিতে সমর্থ হইতেছেন, এবং যে অনুরূপী শক্তির পরিচয় পিতা, মাতা, ভগিনী ও আত্মীয় বন্ধুবর্গের জড়ময় দেহ ও তাহার জড়ময় চিহ্নাবলির অভ্যন্তরে ও অন্তরালে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকেও নিজের মত জীবন, ইচ্ছা বা আত্মা বিশিষ্ট বলিয়া স্বভাবত সহজজ্ঞানে নির্ণয় করিতেছেন ও তজ্জন্য তাঁহাদের প্রতি হৃদয়ের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও স্নেহ প্রেম সমর্পণ করিয়া স্বয়ং কৃতার্থ হইতেছেন,—সেই শক্তির যে অসংসয়িত প্রমাণ তিনি প্রকৃতির প্রত্যেক পদার্থে প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, সে প্রমাণ অগ্রাহ্য করা তাঁহার সাধ্যাতীত। কথার উত্তর দেয় না তাতে কি? আমাদের মত দেহ নয় তাতে কি? আমাদের ন্যায় ইচ্ছামত নড়ে চড়েনা, তাতেই বা কি? উভয় প্রকার শক্তিরই মূলে ঐক্য। যে ঐক্য আজ বার্কলী, হীগেল, মার্টিনো প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কত কষ্টেও জ্ঞানী ও বিজ্ঞানাভিমানী মানবগনকে বুঝাইতে সম্পূর্ণ সমর্থ হইতেছেন না, সেই ঐক্য তখন সরল অজ্ঞ মানব স্বতঃসিদ্ধ সহজ জ্ঞানের সাহায্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাই তখনও এই সিদ্ধান্ত বদ্ধমূল রহিল যে, এই জড়স্বরূপ বা আপাত-প্রতীয়মান জড় প্রকৃতির প্রত্যেক ঘটনার মূলে এক এক অদৃশ্য অজ্ঞাত শক্তিমান দেবতা বিদ্যমান

আছেন। এইরূপে প্রকৃতির অগণিত ঘটনা পরিবর্ত্তনের মূলে জলদেবতা, অগ্নিদেবতা, পবনদেবতা প্রভৃতি অগণ্য দেবতার অভ্যুদয় হইয়াছিল। তখন মানব প্রকৃতির উপাসক নন, প্রকৃতির মূলে শক্তির অসংখ্য আবির্ভাব দেখিয়া তাহারই উপাসক। তখনও কিন্তু বুঝিতে পারেন নাই যে, ঐ বিকাশ এক অখণ্ড শক্তি ভাণ্ডার হইতেই প্রকাশিত। এ সত্য বুঝিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে তাহাও বুঝিলেন। প্রকৃতির অসংখ্য ঘটনাবলির মধ্যে ক্রমে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে একতা দেখিলেন। অগণ্য বিকাশের মূলে একই অদ্বিতীয় অখণ্ড শক্তির বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিয়া বলিলেন "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

উপরে অতি সংক্ষেপে আমরা দেখিলাম যে, একেশ্বরবাদ একেবারে আবির্ভূত হয় নাই। অগ্রে প্রকৃতি পূজা, ক্রমে প্রকৃতির অন্তরস্থিত অদৃশ্য দেবতার পূজা ও অবশেষে তাহাদের একতা লক্ষিত হইলে একেশ্বরবাদ। কিন্তু একেশ্বরবাদ প্রচারিত হইবামাত্রই কি উহা জনসধারণের হৃদয়ে অটল স্থান লাভে সমর্থ হইয়াছে? সর্ব্বসাধারণ সমস্ত লোকই কি আর এক অদ্বিতীয় বিশ্বময়ী শক্তির উপাসনা করিতেছে, না কখনও করিয়াছিল? স্বপ্নেও এ কল্পনা করা বাতুলের কার্য্য। বরং উপাসনা করা দূরে থাকুক, মতেই একেশ্বরবাদ এখনও অতি সঙ্কীর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এ কথাতে আর মত দ্বৈধ হইতে পারে না। কয়জন ভারতবাসী আজ এক মাত্র চিন্ময় পরব্রহ্মের উপাসক? এত কোটী হিন্দুস্থানের মধ্যে কতই লোক আজিও সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহগণ ও নানাবিধ বৃক্ষাদির উপাসনা করিয়া থাকে। কতই না লোক ইন্দ্রাদি দেবগণের অস্তিত্বে আজিও সরল বিশ্বাস দেখাইয়া থাকে! পৌত্তলিকতা লইয়া যে চারিদিকে এত গোলযোগ দেখা যাইতেছে, তাহার একটী কারণ আমাদের মনে হয় এই যে,—উক্ত শব্দটীর একটী সাধারণ অর্থ নাই। এক জন এক অর্থে ব্যবহার করিতেছেন। আর এক জন কল্পিত অপর এক অর্থ গ্রহণ করিয়া তর্ক করিতেছেন। কাজেই এ বিষয়ে কোন স্থির মীমাংসা হইতেছে না। পৌত্তলিক শব্দে আমরা কি অর্থ করি, তাহা বলিবার পূর্ব্বে আর একটী মাত্র মতের সমালোচনা করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা মনে করেন যে, ঈশ্বরের স্মারক কোন চিহ্ন সম্মুখে বা সঙ্গে রাখিয়া ঈশ্বর চিন্তা করাও পৌত্তলিকতা। তাঁহাদের মতে নিরাকার, নিরবলম্ব, চিন্ময় পরমেশ্বরের উপাসকই অপৌত্তলিক। তিনি উপাসনার সুবিধার জন্য, মন স্থির করিতে বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে যদি কোন মূর্ত্তি বা জড় পদার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলেও ইঁহাদের মতে তিনি পৌত্তলিক। দ্বিজদাস বাবুও লিখিয়াছেন যে, "প্রকৃত ব্রহ্ম দর্শন যাহার লাভ হয় নাই, সেই পৌত্তলিক।" অর্থাৎ নিরবলম্ব ভাবে চিন্ময় ব্রহ্মের সাক্ষাৎ উপাসকই প্রকৃত অপৌত্তলিক।

ইহাই যদি পৌত্তলিকতা হয়, যদি নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক হইয়াও কোন বিশেষ জড় পদার্থ বা ছবি কিম্বা প্রতিকৃতি বিশেষের সাহায্যে পূজা করিলে পৌত্তলিক হইতে

হয়, তাহা হইলে কিন্তু "পৌত্তলিক" এই ভয়ানক কথাটার ভীষণত্ব থাকে না এবং প্রকৃতপক্ষে ইহার লোক-প্রচলিত অর্থই থাকে না। অজ্ঞ, মূর্খ লোকদিগের ত কথাই নাই, শিক্ষিত সুবিজ্ঞ, পণ্ডিত লোকেরাই কি সকলে নিরবলম্ব চিৎস্বরূপের উপাসনা করিতে পারেন? যোগবলে, বহুকাল কঠোর সাধনের ফলে যাঁহাদের আত্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানে মিলন হইয়াছে, যাঁহারা সত্যভাবে বলিতে পারেন "I and my father are one," যাঁহাদের গভীর ধ্যান সুস্পষ্ট সমুজ্জল ব্রহ্মানুভূতি, ব্রহ্ম স্পর্শ, ব্রহ্মদর্শন; যাঁহারা এরূপ ব্রহ্মগত প্রাণ যে, সরলভাবে বলিতে পারেন "আমরা তোমাতে বিচরণ করি, রমণ করি, তুমি গৃহ; তুমি প্রাণস্য প্রাণম্!" অথবা "In thee we live and move and have our being."——তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। এই মতানুসারে তাঁহারাই প্রকৃত অপৌত্তলিক। নতুবা তুমি আমি খ্রীষ্টান, মুসলমান, ইহুদী, বৌদ্ধ, হিন্দু, ব্রাহ্ম—ভাই, সাধারণ আমরা সবাই পৌত্তলিক। এই নাম তাহা হইলে আর কঠোর ও লজ্জাজনক থাকে না, বরং উহার অর্থ তখন সাধারণ সাধক হইয়া দাঁড়ায়। মহাপুরুষগণ চিন্ময় "নিরাবলম্বমীশং" কি বস্তু তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং প্রচারও করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ কি গাছের ফল যে পাড়িলেই অনায়াসে হাতে পাইব? ঘর, বাড়ী, সংসার, টাকা টাকা করিয়া সমস্ত দিন ২৪ ঘণ্টা কাটাইব, আর ব্রহ্মজ্ঞান হাতে আপনি আসিবে? সাধন চাই, ঘোরতর সাধন চাই। সেই সাধনের যে অবস্থা, তাহাতো উক্ত পৌত্তলিকতা ভিন্ন অন্য উপায় কোথায়? ইহুদী, খ্রীষ্টান, মুসলমান যে যেখানে আছ, জিজ্ঞাসা করি, বুকে হাত দিয়া উপাসনার সময়ে দেখিয়া বল, তুমি চিন্ময় ব্রহ্মের দর্শন পাইলে কিনা। যদি বল "না" তবে তুমি এইরূপ পৌত্তলিক। ভাই ব্রাহ্ম! তুমি লেখকের হৃদয়ের বড় নিকটে, এক মায়ের পেটের ভাই, তোমাকেও বলি, এ হিসাবে ধরিলে আমরা অনেকেই পৌত্তলিক। সে জন্য কথা মাত্র দুঃখিত নই, বরং মনে করি যে এরূপ পৌত্তলিকতা অপরিহার্য্য এবং প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সোপান স্বরূপ। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, কোন শিক্ষিত ব্যক্তি সরল মনে সূর্য্যকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন না। কোন ব্রাহ্ম প্রকৃতি পূজক নহেন, স্বীকার করি। কোন একেশ্বরবাদী উপাসক, প্রকৃতির অসংখ্য ঘটনাবলির মূলে দেবতা লুকায়িত আছেন, তাহাও বিশ্বাস করিতে পারেন, বলি না। এ সকল গ্রাম তিনি অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু এখনও লক্ষ্য স্থলে উপস্থিত হইবার তাঁহার বিলম্ব আছে। আজিও তিনি হয়ত নিরবলম্ব হইয়া ঈশ্বরের পূজা করিতে পারেন না, পারিবেন কিরূপে? জড় পদার্থে তাঁহার দেহ নির্ম্মিত, তাঁহার বাহ্য ও এমন কি আন্তরিক বৃত্তি সমুদায়ও বাহ্য জড়ের প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিতেছে। এই জড়ের বন্ধন অতিক্রম করিয়া আত্মার গভীর প্রদেশে প্রবেশ করিবার এখনও তাঁহার সাধ্য কৈ? কঠোর সাধনের সাহায্যে আত্মজ্ঞান পরিষ্কার না হইলে পরমাত্মতত্ত্ব তাঁহার হৃদয়ে ফুটিবে কি উপায়ে? যতদিন না তাহা হইতেছে, তত দিন তিনি জড় উপায়ে জড়ের প্রত্যক্ষসিদ্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর

করিয়া চলিতে বাধ্য। যত দিন তিনি Objective অর্থাৎ বাহ্য বস্তুর উপর নির্ভর করত তাহার দ্বারা Subjective অর্থাৎ আভ্যন্তরিক আলোচনা করিয়া তবে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইবেন। এ অতি সত্য কথা, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সাধন অবশ্য কঠোর। কিন্তু শিশুর অক্ষর পরিচয় কিরূপ দুরূহ শিক্ষা, তাহা পাঠক মাত্রেরই স্মরণ আছে। তাহার পর আবার সেই শিশুই কলম ধরিয়া কি ভয়ানক দ্রুততার সহিত সহস্র সহস্র অক্ষর একত্র সম্বন্ধ করিতেছে, সংযোগ করিতেছে, লিখিতেছে, আবার তার মধ্যে কেমন সুন্দর অর্থ গুপ্ত ভাবে খেলিতেছে, সেই লেখা আবার শত শত শিশুরা অবলীলাক্রমে পাঠ করিতেছে, তখন পূর্ব্বকালের কষ্টসাধ্য অক্ষর পরিচয়ের কথা হয় ত স্মরণই হয় না। এ সাধনেও ঠিক তদ্রূপ হয়। জড দেহ জড় যন্ত্র বিশিষ্ট হওয়ার আমাদের Subjective মানসিক বা আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া সমূহও প্রথমাবস্থার Objective বা বাহ্য জড় রাশির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া চলিতে বাধ্য। এজন্য নিরাকার নিত্য সত্য চিন্ময় পরব্রহ্মের উপাসক হইতে গেলে জড়ের সাহায্য লইয়া আরম্ভ না করিলে চলিবেনা, এ কথা এক পক্ষে অতি সত্য সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র রাশির অপরূপ শোভা জড় সম্ভূত, ও তাহাদের জ্ঞান জড়ময় ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ; সুতরাং জড় মূলীয়। কাজেই হে জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীপূর্ণ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা! এই বলিয়া ঈশ্বরকে সম্বোধন করিতে গেলে প্রথমে জড় জগৎ ও জড় ইন্দ্রিয়ের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে। এই হিসাবে অগ্রে পৌত্তলিক না হইয়া জড় উপকরণের সাহায্য না লইয়া, জড় অবলম্বন ব্যতীত আমরা ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করিতেই সমর্থ হই না। ক্রমে সাধক বাহ্য অবলম্বন হইতে যাহা প্রাপ্য তাহা গ্রহণ করিয়া নিঃশেষ করিতে থাকিবেন, আর এ দিকেও সাধন বা অভ্যাস বলে তাঁহার আভ্যন্তরিক শক্তি সমুহের বিকাশ অধিকতর বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। অবশেষে এমন এক স্থানে হয়ত আসিয়া উপস্থিত হইবেন, যথায় আসিলে ইহ জীবনেই বাহ্য সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া, ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রাণ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবেন। যখন নিরবয়ব হইয়াই সনাতন, চিন্ময় পরমাত্মাকে নিজ বিশুদ্ধীকৃত আত্মাদর্পণে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়া সম্পূর্ণ জড়াতীত রাজ্যে প্রথম পদার্পণ করিবেন। তাহার পরে আরও কতদূর যাইবেন, অনন্ত উন্নতিশীল মানবাত্মা কোথায় চলিবে তাহা কে জানে?

সুতরাং স্পষ্টই প্রমাণিত হইল যে, এই শ্রেণীর লোকদিগের মতানুসারে পৌত্তলিকের লক্ষণ ঠিক হয় না, বরং শব্দটারই অতি বিকৃত, অস্বাভাবিক এক অর্থ ধরিয়া লইতে হয়। তাহাতে পৌত্তলিক (Idolator) ও একেশ্বরবাদী (Theist) এই দুটা শব্দের চিরপ্রচলিত সহজ জ্ঞান-সিদ্ধ পার্থক্য নষ্ট হইয়া যায়। ইহা কোন মতেই প্রার্থনীয় নহে। এক একটী শব্দ এক একটী সুচিহ্নিত অর্থে ব্যবহৃত হইবার জন্যই সৃষ্ট। সেই অর্থের ব্যভিচার যেখানে হয়, সেখানের সেই শব্দেরও বিনাশ বলিতে হইবে। একারণ আমরা পৌত্তলিকতার ঈদৃশ বিকৃত ব্যাখ্যা গ্রহণে প্রস্তুত নহি। যতক্ষণ কোন লোক ঈশ্বর বলিলে বিশ্বপতি, অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বগুণাধার, চিন্ময় ব্রহ্ম

বলিবে ও নিরাকার মনে বিশ্বাস করিবে, ততক্ষণ সে যে চিহ্নকেই স্মারক বা হৃদয়ের ভাব উত্তেজনার সহায় মনে করুক না কেন, আমরা তাহাকে পৌত্তলিক শব্দবাচ্য কদাচ করিতে পারি না। তবে, যেই দেখিব যে সেই ব্যক্তি উক্ত চিহ্নসমূহের কোনটার চিহ্নত্ব মাত্র বিস্মৃত হইয়া উহাকে ঈশ্বর বোধ করত নিজ হৃদয়ের প্রীতি ভক্তি, উপাসনাদি উহাতেই অর্পণ করিতেছে,—অমনি বুঝিব যে সে পৌত্তলিক। সুতরাং পৌত্তলিক ও অপৌত্তলিকের সীমা রেখা এই খানে পড়িল যে—আমি সহস্র চিহ্ন ব্যবহার করিতে পারি কিন্তু যতক্ষণ আমার নিকট উহারা চিহ্নমাত্র, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার সহায় মাত্র, ততক্ষণ আমি পৌত্তলিক নহি। এমন কি ঐ সকল চিহ্ন আমার পক্ষে যদি অত্যাবশ্যকীয় হয়, অর্থাৎ যদি উহাদের সাহায্য ব্যতীত আমার উপাসনা না হয়, তথাপি আমি পৌত্তলিক নহি। তাহা হইলে অবশ্য আমি সঙ্কীর্ণচেতা একেশ্বর উপাসক,—নিম্ন শ্রেণীর সাধক; কিন্তু পৌত্তলিক কদাচ নহি। তবে পৌত্তলিক কে? না—যে ঐ সকল বাহ্য জড় সাহায্যেরই উপাসক, তাহাদিগকেই পূজা করে, তাহাদেরই নিকট প্রার্থনা করে এবং বিশ্বাস করে যে, তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা আছে। মনে করুন, এক জন ব্রাহ্ম গঙ্গাতীরে বসিয়া আছেন, গঙ্গার হিল্লোল বড় সুন্দর দেখাইতেছে, ও তাঁহার মনে কি সব অপূর্ব্ব, স্বর্গীয় ভাবের উদ্রেক করিয়া দিতেছে। তিনি গঙ্গা সলিলের মধ্যে পরমেশ্বরের অপার মহিমা, সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলময় ভাবের স্পষ্ট নিদর্শন পাইয়া বিমোহিত হইয়াছেন, চক্ষু দিয়া অবিরল প্রেমাশ্রু বহিতেছে। ইনি ত বাহ্য সাহায্যে ঈশ্বরের পূজা করিলেন, ইনি কি পৌত্তলিক?—কখনই না। আর মনে করুন, অপর এক জন সরল বিশ্বাসী হিন্দু সন্তান সেই খানে বসিয়া গঙ্গার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন। পুরাণের ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গা আনয়ন ও সেই সলিল স্পর্শে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদিগের উদ্ধার বৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ায় "পতিত পাবনী গঙ্গে! মা নিস্তারিণি! এ অধমকে উদ্ধার কর" বলিয়া তিনি ব্যাকুলতার সহিত কিঞ্চিৎ গঙ্গোদক মস্তকে ছড়াইয়া দিলেন। চক্ষু দিয়া তাঁহারও ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। এ স্থলে তাঁহাকে কি বলিব?—অবশ্য পৌত্তলিক বলিতে হইবে। কেন না তিনি, ভ্রম প্রবৃত্তই হউক আর যাই হউক, গঙ্গাকেই তাঁহার উপাস্য দেবতা মনে ভাবিতেছেন। আমাদের হিন্দু পৌত্তলিকতার এরূপ লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত তুলিতে পারা যায়, কিন্তু আর বোধ হয় আবশ্যক হইবে না। এক্ষণে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী এক জন রোমান ক্যাথলিকের কথা মনে করুন। তাঁহার গৃহে এক খানি খ্রীষ্টের ক্রুশ বিদ্ধাবস্থায় ছবি রহিয়াছে; তিনি গভীর ভক্তির সহিত যখন ছবি খানির নিকট অগ্রসর হইবেন, তখন তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইবে কল্পনা করুন—খ্রীষ্ট ঈশ্বরের অবতার, স্বয়ং ঈশ্বর। সুতরাং উক্ত ছবি ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি। ঈশ্বর মানবের পাপভার মোচনের জন্য কত ক্লেশ স্বয়ং বহন করিয়াছেন, মনে করিয়া বিশ্বাসী খ্রীষ্টান ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইবে ও তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অশ্রুবারি বিনির্গত হইবে। ইনি পৌত্তলিক কি না?—কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে, এ স্থলে খ্রীষ্টকে ঈশ্বর মনে করায়

ইনি বস্তুতই পৌত্তলিক। কিন্তু আর এক জন লোক উক্ত ছবিটীর প্রতি চাহিয়া দেখিলে যদি তাঁহার মনে খ্রীষ্টের অমানুষিক স্বার্থ ত্যাগ, অটল বিশ্বাস, ও অতুলনীয় মনের প্রেম প্রভৃতির কথা যুগপৎ স্মরণ হইয়া তাহাকে (মানব) খ্রীষ্টের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত করে, ও যদি তিনি ভাবে বিহ্বল হইয়া সাধু চরিত্রের প্রণোদক ও প্রেমের মূল প্রস্রবণ করুণাময় পরমেশ্বরের প্রতি দৃঢ়তর বিশ্বাস ও গভীরতর প্রীতি স্থাপন করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে কোন্ বুদ্ধিমান লোক পৌত্তলিক বলিবেন। আর দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

এক্ষণে আশা করি পাঠকবর্গ সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলেন, আমরা পৌত্তলিক কাহাকে বলি। আর ইহা আমাদের স্বকপোল কল্পিত বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক লক্ষণ নহে। কিন্তু কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, ইহাই "পৌত্তলিক" শব্দটীর আপামর সাধারণ সমস্ত লোকের গৃহীত অর্থ। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকদিগকে দ্বিজদাস বাবু পৌত্তলিক বলিতে চাহেন না। কেন না ইহাদের ভ্রান্ত কুসংস্কারের মূলে কেবল মাত্র জ্ঞানের অভাব লক্ষিত হয়। প্রকৃত ঈশ্বর জ্ঞানের অভাবই যে পৌত্তলিকতার মূল, তাহা আমরাও স্বীকার করি; কিন্তু তাই বলিয়া পৌত্তলিকতাকে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারিনা। এই সকল লোকেরা যে ভ্রান্ত, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু ইহারা যে পৌত্তলিক তাহাই বা কে অস্বীকার করিতে পারে? ভ্রান্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোক যদি সরল বিশ্বাসী হয়, তবে তাহাতে তাহার মুক্তির ব্যাঘাত হয় কি না, এ প্রশ্নই আমাদের আলোচ্য নহে। মুক্তি মানবমাত্রেই পাইবে; মহাপাতকীও সময়ে মুক্ত হইবে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য, এই শ্রেণীর লোক পৌত্তলিক কি না? তাহার উত্তর আমরা পাইয়াছি। কিন্তু পৌত্তলিক বলিয়া তাহারা ঘৃণার পাত্র কদাচ নয়। অজ্ঞানতা বশতঃ ক্ষতিগ্রস্ত ও ভ্রান্ত বলিয়া বরং কৃপা-পাত্র ও আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও সহৃদয়তার উপযুক্ত। ঘৃণার পাত্র যদি কেহ থাকে, তবে দ্বিজদাস বাবুর সহিত একবাক্যে আমরাও বলি যে "ভণ্ড"।

শ্রদ্ধেয় দ্বিজদাস বাবু নিজে একজন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্ম হইয়াও বর্ত্তমান সময়ের নিরাকার চিন্ময় ঈশ্বরের উপাসক ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রণালীর প্রতি কিঞ্চিৎ অবৈধ আক্রমণ করিয়াছেন ও নিজের মত সমর্থন জন্য ব্রাহ্মদিগের উপাসনার বিকৃত ও অযথা বর্ণন করিয়াছেন দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছি। তিনি একস্থলে লিখিয়াছেন যে, আমরাও কোন আকার আরোপ না করিয়া ঈশ্বরের পূজা করিতে পারিনা— আশ্চর্য্য কথা! অবাক হইয়াছি! "ঈশ্বর আমার হৃদয়ে বা এই ব্রহ্ম মন্দিরে আছেন" একথা বলিলে হৃদয়ের বা উক্ত মন্দিরের বাহিরে নাই বুঝায়, দ্বিজদাস বাবুর একথা সত্য মূলক কি না, ব্রাহ্মগণ তাহার বিচার করিবেন। কিন্তু আমরা মনে করি যে, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, এই জন্যই তিনি আমার হৃদয় বা এই মন্দির পূর্ণ করিয়া আছেন, ইহাই মনে হয়। গভীর ধ্যানের সময় যখন তাঁহার সত্তা হৃদয় পূর্ণ করে, তখন অবশ্য বাহিরে তিনি আছেন কি না সে কথা মনেই উদয় হয় না; কিন্তু

দিনীর ন্যায় তাঁহার আত্মাকে ভূমে নিপাতিত করিয়া বক্ষে পদার্পণ পূর্ব্বক মুণ্ডমালা রহিয়াছেন ও এক এক করি তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের পরম শত্রু দৈত্য দানব দলকে সংহার করিতেছেন—এই ভীষণ ভাবের মধ্যে মঙ্গল ইচ্ছার শুভ সমাবেশ যদি সুস্পষ্ট অনুভব করেন,—তবে ইহা বিবেচনা করা কি অসঙ্গত যে, পাছে অন্য সময়ে তাঁহার এই অদ্ভুত [illegible] প্রার্থনীয় ভাবটী বিস্মৃত হন? এই [illegible] অভিপ্রায়ে তিনি এক [illegible] নির্ম্মাণ করিবেন, যা[illegible] তাতে উক্ত [illegible] সম্পূর্ণ নিদর্শন থাকিবে এবং যাহা দেখিবামাত্র তাঁহার সেই অবস্থা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ে পুনরায় আবির্ভূত হইবে? এই কল্পনাপ্রসূত ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি কি প্রচলিত কালী মূর্ত্তির সদৃশ নয়? মনে করুন, এই রূপেও নিরাকার ঈশ্বর উপাসকের মনে সময়ে সময়ে মূর্ত্তি কল্পিত হইতে পারে। এই জন্যই বলা হইয়া থাকিবে যে, "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা।" সাধনের সুবিধার জন্য এইরূপ মূর্ত্তি সম্মুখে থাকিলে উপরোক্ত সাধকের পক্ষে অবশ্য কোন দোষ আরোপিত হইতে পারে না। বরং সময় বিশেষে ইহা দ্বারা তাঁহার সমূহ উপকার ও মঙ্গল হইয়া থাকে। আমরাও এই রূপ সময়ে সময়ে কোন ভাব অযাচিত রূপে প্রাপ্ত হই, হইয়া তাহার এমন একটী নামকরণ করি যে, নামটী মনে উদিত বা মুখে উচ্চারিত হইবামাত্র সেই চমৎকার ভাবটী মনে সম্পূর্ণ নূতন [illegible] বে আচ্ছাদিত হয়। এই নাম কিছু কাল ধরিয়া সাধন করিতে করিতে উক্ত ভাব প্রাণের মূল পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় ও অধিকার করিয়া ফেলে। প্রত্যেক সাধকেরই নিশ্চয় এরূপ হইয়া থাকিবে। যদি ঐ নামকরণ, ঐ নাম সাধন না করি, তবে উক্ত অযাচিত ভাব প্রাণকে কখনই অধিকার করিতে সমর্থ হয় না। ক্ষণিক উত্তেজনা মাত্র করিয়া দিয়া চিরদিনের মত তিরোহিত হয়, এবং কখন যে তাহা আমি পাইয়াছিলাম, তাহা স্মরণও থাকে না। এই রূপে অবহেলায় কত সাধক যে কত অমূল্য ভাবকে জীবনে দৃঢ় করাইতে পারিতেছেন না, কত [illegible] এর বার্থ হইয়া যাইতেছে, কে গণনা করিবে?

কিন্তু এখানে দুইটী কথা আছে। ঐ নাম বা ঐ মূর্ত্তি যখনই উক্ত সাধক নিজে লইবেন বা দেখিবেন [illegible] নই ভাব সঙ্গ বা Association [illegible] র গুণে তাঁহার মনে সেই ভা[illegible] [illegible] উপস্থিত হইবে। কিন্তু তাহাতে অপরের কি? যে কখন সে ভাব পায় নাই, তাহার সে নামে বা সে মূর্ত্তিতে কি উপকার হইবে? এ গূঢ় সমস্যা কেহ তলাইয়া দেখিয়াছেন কি? একের পক্ষে যাহা অনন্ত ভাবের খনি, অসীম খেলার ক্ষেত্র, অপরের নিকট তাহা কেবল অর্থশূন্য শব্দ বা ছবি মাত্র প্রতীয়মান হইবে। কাজেই একের কল্পিত ও অবলম্বিত শব্দে বা মূর্ত্ত চিহ্নে অপর [illegible] বিন্দু মাত্র উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। এই গূঢ় রহস্যই তেত্রিশ কোটী [illegible] মূর্ত্তির কল্পনা প্রসবের [illegible] [illegible] হয়। যাঁহার যে ভাব উদয় হইয়াছে, তিনি সেই ভাবেই ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা [illegible] ছেন, ও মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সাধন বলে হয়ত সিদ্ধও হইয়াছেন। লোকে না বুঝিয়া তাই অবলম্বন করিতে গিয়া ভ্রান্ত পৌত্তলিকতা জালে জড়িত হইয়া মূলের আধ্যাত্মি-

কর্ত্তা হারাইয়াছেন। মূর্ত্তি আগে, তার পর সাধন এ মিথ্যা কথা। আগে সাধন, পরে ভাব প্রাপ্তি, ও ঐ ভাবের নামকরণ বা অনুরূপ রূপকের দ্বারা কল্পনা প্রসূত বর্ণনা বা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ (alligorical representation)। আগে নিরাকার চিন্ময় ব্রহ্মের জন্য লালায়িত হইয়া ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা, চিন্তন, মনন, ধ্যান, ধারণা, পরে ব্রহ্ম কৃপায় ভাব প্রাপ্তি, ও তৎপরে আবশ্যক মত নাম বা রূপ [illegible] বলা হইয়াছে, ভক্তের গৃহে ভগবানের জন্ম ও নামকরণ হয়। এই গেল প্রথম কথা। আরও একটী কথা এই যে, সাধকের যে কেবল একটী [illegible] ভাব লইয়াই পরিতুষ্ট থাকা উ[illegible] কদাচ নহে। তিনি ভাব প্রাপ্তির [illegible] লক্ষ্য করিয়া বসিয়া থাকিবেন? তাহা ত তাঁহার চরম উদ্দেশ্য নয়, চরম লক্ষ্য ব্রহ্ম দর্শন, নিত্য ব্রহ্মলাভ, তৎসঙ্গ, তন্ময়ত্ব। তবে তিনি কেন একটী মাত্র ভাব পাইয়া তাহার নাম বা রূপ দিয়া কৃতার্থ হইবেন? তিনি অনন্ত ভাবসাগরের তীরে বসিয়াছেন,—অগণিত ভাব তরঙ্গ তাঁহাকে আঘাত করিবে, ঠেলিবে, ফেলিবে, ফুলাইবে, ডুবাইবে, ভাসাইবে, উল্টাইবে,—কত কি করিবে। তিনি অবোধ শিশুর মত একটী মাত্র [illegible] খাইয়াই ভুলিয়া রহিবেন, ও কাহাকে [illegible] নামরূপ লইয়া ভুলিয়া থাকিবেন? দুর্লভ মানবজীবন [illegible]ভাবে কাটিয়া যাইবে? অনন্তপ্রবাহ জীবনস্রোত তাঁহার একটী ক্ষুদ্র কূটে চির আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন? বাতুল! ছি!! এরূপ করিতে নাই। ভাব আসে আসুক, না আসে ক্ষতি নাই। আমি চাই সেই প্রেমসাগরে ডুবিতে, খেলিতে, আমি কেন সন্তুষ্ট হইব সিকি পয়সার একটী ভাবে? একের পর আর; আরের পর আবার; এইরূপ অগণ্য ভাবের তরঙ্গ আসিবে, ও আত্মার স্বরূপ মূর্ত্ত অবলম্বনকে কখনও বদ্ধাবস্থায় থাকিতে দিবে না। ক্রমে অবশেষে যখন ব্রহ্মসাগরে ডুবিব, তখন আত্মা সেই পরমাত্মাময় হইয়া যাইবে; আর চিহ্ন আবশ্যক কোথায়?

[illegible]থা স্মরণ থাকিলে পাঠকগন [illegible] অবলম্বন সাহায্যে ব্রহ্মো[illegible] আমাদের [illegible] দেশের প্রচলিত পৌত্তলিকতায় কত [illegible] পাতাল প্রভেদ। শেষোক্ত পৌত্তলিকতাও প্রকৃতি সম্বন্ধে সকলেই অভিজ্ঞ, সুতরাং সে কষ্টজনক দৃশ্যের বর্ণনা করিয়া সম্প্রদায় বিশেষের মনঃক্ষুণ্ণ করা অনাবশ্যক। তবে এই টুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে বর্ত্তমান প্রচলিত পৌত্তলিকতায় মধ্যে প্রকৃত প্রাণ অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা কিছুই নাই। দেশের বর্ত্তমান সময়ের অধিকাংশ সংখ্যক লোকই জড় মূর্ত্তিকেই ঈশ্বর বোধে পূজা করে। অজ্ঞানতাবশত ঈশ্বরের প্রাপ্য পূজা তাহারা জড়ে অর্পণ করে। এবং আর অধিক ক্লেশের কথা সব আছে, তন্মধ্যে ২। ১ টা বলিলে পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। যেমন কদন্ প্রাতিশয্যের সময় জলে মূর্ত্তিকে স্থিত রাখা, রাত্রে মশারীর মধ্যে রাখা প্রভৃতিতে কি বোধ হয় না যে, তাঁহারা ঐ মূর্ত্তিটাকেই পূজা করেন, তাহা[illegible] চিহ্ন মনে করিয়া পরমাত্মার উপাসনা [illegible] না? তাঁহাদের দেব দেবীর ধ্যান করিবার সময়ে তাঁহারা যে সকল মন্ত্র জপ করেন, তাহার মধ্য হইতে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ

করা যায় যে, তাহাদের লক্ষ্য ঐ মূর্ত্তি মাত্র। অজ্ঞানতাই ইহাদের অপরাধ, অবশ্য স্বীকার করিলাম, কিন্তু সে অপরাধ জন্য যে তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত নন, দ্বিজদাস বাবুর মতের সহিত এই স্থানে আমাদের ঐক্য হইল না। তিনি যে বলেন "অথবা তোমার কথাই যদি সত্যমানা যায়, যদি আকারেই তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকে,—তদ্বারা তাহাদের ঈশ্বর সাধনায় ব্যাঘাত হয়, এমন মনে করা যায় না।" ইত্যাদি। তিনি যে লাট সাহেবের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা নিতান্ত বালক ভুলান উপমামাত্র হইয়াছে। এইরূপ উপমা আমরা তাঁহার মত লোকের নিকট প্রত্যাশা করি নাই, এজন্য তাঁহার এই স্থলটুকুর জন্য দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছি। পরে লিখিয়াছেন "যে দেবতা বা জড় বস্তুকেই লক্ষ্য করিয়া তুমি পূজা কর, ঈশ্বর দয়া করিয়া অবশ্যই তোমার সে পূজা স্বয়ং গ্রহণ করিবেন, কালে তোমার নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিবেন।" এই স্থলটী লেখকের অত্যন্ত আত্মবিরুদ্ধ হইয়াছে। তিনিই এক স্থলে লিখিয়াছেন, উপাসনার উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে প্রসন্ন করা নয়। তাঁহাকে খুসী করা যদি উপাসনার লক্ষ্য হইত, আর না জানিয়া শুনিয়া তাঁহার বদলে যদি এক খণ্ড কাষ্ঠ বা প্রস্তরকে খুসী করা যাইত, তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর হাসিয়া বলিতেন,—"তোমরা আমাকে মনে করিয়াই যখন জড়ের উপাসনা করিতেছ, তখন উপাসনা আমি স্বয়ংই গ্রহণ করিলাম। এই আমি আসিয়াছি, বৎস বুঝ, বর প্রার্থনা কর।"!! নতুবা তাঁহার বালক ভুলান কথা কিরূপে সঙ্গত, বুঝিতে পারি না। আরও এক অনুরূপ অদ্ভুত যুক্তিবিরুদ্ধ কথা উক্ত প্রবন্ধে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কোন চিত্রকর যখন কোন চিত্র অঙ্কিত করেন, তখন তাঁহার আত্মা সেই চিত্র রূপই ধারণ করে। এইত এক অদ্ভুত মত, যাহার কোন প্রমাণ লেখক দেন নাই। তার পর আবার এই মত উপমা স্বরূপ লইয়া আর একটী মত সম্ভবপর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন যে, "সেইরূপ চিত্রকর··· দুর্গা কালী মূর্ত্তিমাত্র কল্পনাতে ধারণ করিয়া যদি ভক্তের নিকট আবির্ভূত হন, ভক্ত তখন তাঁহাকে দুর্গা কালী রূপেই আবির্ভূত দেখিতে পাইবেন।"—ভয়ানক মত! শ্রদ্ধেয় দ্বিজদাস বাবু নিজেই ইহার তীব্র প্রতিবাদ না করিলে বিস্মিত হইব। সত্য বটে তিনি "যদি তবে" দিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন, তথাপি এরূপ সম্ভব মনে করাও আশ্চর্য্য। সে টুকু নির্দোষ;—যে ভক্ত বাল্যকালাবধি দুর্গা বা কালী মূর্ত্তি বিশেষ অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন এবং ঐ ঐ মূর্ত্তিতেই ঈশ্বর আবির্ভূত হইবেন এই আশা হৃদয়ে পরম আদরে পোষণ করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে অতিশয় স্বাভাবিক যে, তিনি ঐ রূপ মূর্ত্তি সাধন পথে অগ্রসর হইলে দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতে পারেন। এ টুকুতে লেখকের কোন দোষ দেখিনা, কেননা বাস্তবিকই রামপ্রসাদ প্রভৃতি ভক্তগণ কালীমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতেন, এরূপ প্রবাদ আছে। ভক্ত সাধকের পক্ষে তাঁহার কল্পনার উগ্রতা প্রযুক্ত বা অন্য কোন কারণে সম্ভূত হওয়ায় সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে পারি যে, তিনি স্পষ্ট দেখিলেন, ঐরূপ একমূর্ত্তি। তাহাতে কি? তাহাই কি বিশ্বস্রষ্টা, পাতা, বিধাতা সেই পরব্রহ্মের আকার? যাঁহাকে

এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন? এবং শ্রদ্ধেয় বিজয়দাস বাবুইবা তাহার কি প্রমাণ দিতে পারেন? "যদি ভক্তের নিকটে আবির্ভূত হন" এই টুকুর কি প্রমাণ দিতে তিনি প্রস্তুত?—সেই মূর্ত্তি ত স্বয়ং পরমেশ্বরের মূর্ত্তি নয়, তাঁহার নির্দ্ধারিত আকার নয়, তাঁহার নিজ চেহারা ত সেটা নয়ই নয়। তবে সে কি ব্রহ্ম দর্শন হইল? কেবল পূর্ব্বোক্ত মত একটা ভাববিশেষের পরিগৃহীত মূর্ত্তিমাত্র, তাহার মূল্য কত, তাহা পূর্ব্বে বিশদ রূপে লিখিত হইয়াছে। সাধক বলিবেন "কেন? প্রমাণ আছে, আমার সেই মূর্ত্তি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, ভক্ত তোমার ব্রতার্থে আমি তোমার সম্মুখে এই বেশে আসিলাম। এই যে মূর্ত্তি দেখিতেছ, ইহার মধ্যে আমি আছি। ইহা অপেক্ষা আর কি প্রমাণ চাও?" হাসির কথা! অবিশ্বাস করি না। ভক্ত ওরূপ কথা হয়ত শুনিতে পাইলেন; তাহাতেই কি সেই মূর্ত্তি দর্শন হইল, আর শোনা হইল। একটা কথা যে সেই মূর্ত্তিতে ভগবান আবির্ভূত। সে মূর্ত্তি দর্শন আর ব্রহ্ম দর্শন কখনই এক নয়, কেননা তাহা হইলে প্রত্যেক বস্তু দর্শনই ব্রহ্ম দর্শন, কারণ কিসে তিনি আবির্ভূত নন? গাছ, পাথর, নদী, আকাশ, আমার দেহ, কলম, সর্ব্বত্রই ত তিনি বিদ্যমান; তবে আর মূর্ত্ত সাধক আমা অপেক্ষা ও তোমা অপেক্ষা কিসে অধিক ব্রহ্ম দর্শন করিলেন? ব্রহ্ম নিরাকার চৈতন্যময় সর্ব্বশক্তিমত্বা প্রযুক্ত মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়াই ত জগৎময় রহিয়াছেন, এক প্রকার বলিতে হইবে। তবে আর বিশেষ ব্রহ্ম দর্শন তাঁহার কৈ হইল?

এত কথা বলিতে হইত না, এত বাক্য ব্যয় করিতাম না, যদি লেখক নিজে মূর্ত্তিতে বিশ্বাসী হইতেন। তাঁহার মুখে এরূপ আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইয়াছি। বোধ হয় তর্কের খাতিরে এরূপ মত বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহা লেখকের মনোগত কথা নহে; কেননা তাঁহার পরক্ষণেই বলিয়াছেন, "যদি পূর্ণ খণ্ড স্বরূপের পক্ষে দেশ কাল পরিচ্ছিন্ন আকার ধারণ অসম্ভবই হয়" ইত্যাদি। সে যাহা হউক, একটা রূপ দর্শনই যদি উপাসনার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলেও এক দিন উক্ত সাকারদিগের মত সঙ্গত হইতে পারিত। কিন্তু তাহাও নয়। উপাসনার উদ্দেশ্য কি, তাহা উপাসক মাত্রেই জানেন—আত্মার সম্মুখে পরমাত্মাকে সর্ব্বদা রাখিয়া ক্রমে তন্ময়ত্ব লাভ করা। ইহা যদি উদ্দেশ্য, তবে কালী বা দুর্গার মূর্ত্তির সান্নিধ্যে আত্মাকে রাখিয়া তন্মূর্ত্তিময় হইয়া যাওয়াই কি সাকার পৌত্তলিকদিগের লক্ষ্য? অবশ্য নয়। তবে মুক্তি লাভ কি? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাহ্য বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া দিবানিশি মুক্ত ভাবে পরমাত্মার সহবাস ও নিত্য যোগ সংস্থাপনই মুক্তি। ইহাই উপাসনা বা সাধনের লক্ষ্য। তবেই বুঝিয়া দেখুন, সাধন জড়ে বা সাকারের উপাসনায় হয় কি না।

এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আশা করি, বিজয়দাস বাবু বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, পৌত্তলিকতাতে সাধকের আত্মার উপকার না হইয়া বরং অধোগতিই হইয়া থাকে; এবং জাতিভেদজনিত বৈষম্য ব্যতীত, আমাদের দেশে যে পৌত্তলিকতা প্রচলিত আছে, তাহাতে পৌত্তলিকতায় চিরনিবদ্ধ অনেক দোষ

আছে। এখন আর তিনি বা পাঠক বর্গের কেহই বলিতে পারিবেন না যে, পৌত্তলিকতাতে স্বত কোন দোষ নাই। পৌত্তলিকতাতেই দেশ অধঃপতিত হইয়াছে। মানবের আত্মার মহত্ত্ব বিনষ্ট করিয়া জড় সহবাসে তাহাও প্রভূত পরিমাণে জড়ত্ব আনিয়া দিয়া আমাদের সোণার দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। প্রাণস্ত প্রাণম্ চিন্ময় পরমাত্মার উপাসকগণ বিস্মৃত হইয়া কেবল অন্ধ বিশ্বাসের আবর্ত্তে পড়িয়া ভ্রম ও কুসংস্কারের দৃঢ় শৃঙ্খলে শ্রীবাদেশ সম্বদ্ধ করিয়া কোটী কোটী নরনারী শতাব্দীর পর শতাব্দী দুর্লভ মানবজীবন বৃথায় হারাইয়া দেশের দুর্গতি শতধা বর্দ্ধিত করিতেছে। এ পৌত্তলিকতার বীজ পর্য্যন্ত ভারতক্ষেত্র হইতে উৎপাটিত করিয়া সত্যের জলন্ত বহ্নিতে দগ্ধ করা প্রত্যেক ব্রহ্মোপাসকের অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মকর্ম্ম। যিনি তৃণ কণা স্থলান্তরিত করিয়াও এই মহাব্রতের সহায়তা করিতে সমর্থ হন তিনি ধন্য!

তবে যাহারা খ্রীষ্টানদিগের বৃথা অনুকরণে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে চিন্তাশূন্য চীৎকার ধ্বনি উত্তোলন করিয়া অনর্থক স্বদেশীয় সরল বিশ্বাসী ভ্রাতৃগণের নিন্দাবাদ করে ও তাঁহাদের বিশ্বাসের ধর্ম্মকে উপহাস করিয়া হৃদয়ের নীচতার পরিচয় দেয়, তাহাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ গর্হিত কার্য্যের সহিত আমাদের কোন সহানুভূতি নাই, বরং অমিশ্রিত ঘৃণার চক্ষে আমরা তাহাদের কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করি। ধার্ম্মিক সাধকেরা পাপী নারকীকেও ঘৃণা করিতে পারেন না; পৌত্তলিক ত উপাসক, তাঁহার ত কথাই নাই। ভ্রান্ত অজ্ঞান বলিয়া কৃপাকাতর সজল নয়নে তাঁহার হাতে ধরিয়া বুঝাইতে হইবে। উপদেশ ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহার প্রমাণ করিয়া নিজ গৃহীত সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সময়ে সত্য জ্ঞানের আবির্ভাবে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার আপনি পলায়ন করিবে। অন্ধকারকে দূর করিতে হইলে অন্ধকারের নিন্দাবাদ বা তাহার সহিত বৃথা যুদ্ধে ফল কি? জ্ঞানী ব্যক্তি সেখানে আলো জালিয়াই অন্ধকার দূর করেন। সে আলো থাকে, অগ্রসর হও।

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ।

# আসাম ও বাঙ্গালী।

## (প্রতিবাদ।)(১)

কোন জাতির চরিত্র সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে সেই জাতীয় লোকদিগের সহিত বিশেষ ভাবে আলাপ পরিচয় করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তাহাদিগের সহিত কিছু কাল বাস করিয়া তাহাদিগের ধর্ম্ম, রীতি, নীতি, বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে তাহাদিগের জাতীয় চরিত্রের কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। এরূপ না

(১) এই প্রতিবাদটী আমরা সানন্দে পত্রিকাস্থ করিলাম। কোন জাতি, সম্প্রদায় বা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অবিচার হয়, ইহা আমাদের অনিষ্ট। এ বিষয় লইয়া আর বাদ প্রতিবাদ প্রকাশ করিতে আমাদের ইচ্ছা নাই বলিয়া প্রবন্ধ-লেখকের মর্ম্ম অর্থ বুঝাইবার জন্য ও তাঁহার প্রতি অবিচার না হয়, এই জন্য আমরা স্থানে স্থানে ফুটনোট করিয়া দিলাম। এই স্থানে বলিয়া রাখা উচিত যে, প্রবন্ধ-লেখক যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা অতি দুঃখের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন, নিন্দা প্রচারের জন্য নহে। ন, স।

করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে একস্থান দিয়া চলিয়া যাইতেছি, ইতি মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির দুর্ব্যবহার দেখিয়া তাহাদের সমস্ত দোষ সেই জাতির উপর চালিয়া দেওয়া [ যেমন লেখক করিয়াছেন ] কত দূর ন্যায়সঙ্গত, বুঝিতে পারি না। তারপর আবার লোক মুখে কাহারও দোষের কথা শুনিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণের নিকট প্রচার করা যে কত দূর ভ্রমসঙ্কুল, কে না বুঝিতে পারে? দোষ থাকিলেও তাহা ঘোষণা না করিয়া প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতে পারিলে কিঞ্চিৎ সুফল ফলিতে পারে। দোষ ঘোষণাতে বরং আসামে বাঙ্গালী-বিদ্বেষাগ্নিতে "ইন্ধন" দেওয়া হয়।

এক আসামে যত প্রকার পার্ব্বত্য জাতি বাস করে, ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে এরূপ আছে কি না সন্দেহ, এবং তাহাদিগের মিশ্রনে যত প্রকার সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ইহাদিগের রীতি নীতি ও চরিত্র বর্ণনা করা অতি কঠিন ও গুরুতর দায়িত্বের কার্য্য। ডাক্তার বুকেনন, পেমবারটন, রবিনসন প্রভৃতি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ আসামের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারাও এমন ভাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাবাসী নিম্ন শ্রেণীর সমস্ত লোকদিগকে "নীতিহীন, চরিত্রহীন, ধর্ম্মহীন, মনুষ্যত্বহীন" বলিয়া সম্বোধন করিতে সাহসী হন নাই। উক্ত প্রবন্ধ-লেখকের সাহস ও আসাম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাকে ধন্যবাদ!

১। "ব্যভিচার নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে দোষ বলিয়াই গণ্য নহে—পিতা কন্যাকে গবর্নমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মপ্রাপ্ত বড় লোকের সংবাসে রাখিতে পারিলে সম্মান বোধ করে।"

২। "পাঠকগণ শুনিয়া চমকিত হইবেন, আসামের অধিকাংশ স্থলে প্রকাশ্য বেশ্যা নাই—তাহার কারণ ভদ্র পরিবার ভিন্ন বাড়ীতে বাড়ীতে সকলেই * ঐ ঘৃণিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে।"

৩। "স্ত্রীলোকে উপার্জ্জন করে পুরুষেরা ঘরে বসিয়া খায়।"

৪। "আতিথ্য প্রথা কোথাও নাই, তবে গুপ্ত প্রণয় খুলিতে পারিলে দ্বার অবারিত।"

দেখা যাউক এই কথা গুলি কতদূর সত্য। এক একটা করিয়া এই সকল মন্তব্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই।

মোটামুটী ধরিতে গেলে আসামে মেচ্, লালুং, হাজং, কাছাড়ী, রাভা, ছুটীয়া কোচ্, আহম্, খাম্‌তি, অব, ডবা, মিরি, মিস্‌মি, মিকির, খাসিয়া, গারো, নাগা প্রভৃতি অসভ্য জাতি বাস করে। এই সকলের আবার শাখা, উপশাখা আছে। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলির ভাষা, আচার প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কতকগুলি একে অন্যের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। ইহাদের মিশ্রণে কত শঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, কে গণনা করিবে? ইহাদিগের বিবাহ পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। কোন্ জাতি কোন্ জাতির সহিত, কোন্ শাখা কোন্ শাখার সহিত বিবাহ

* "ই" শব্দটী প্রবন্ধ-লেখকের নহে। "সকলেই" ও "সকলে"—উভয়ের এক অর্থ নহে। যাহা হউক, "সকলে" শব্দটী প্রয়োগ করায় প্রবন্ধ-লেখকের নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। এই অন্যায় শব্দ প্রয়োগে আমরা বাস্তবিকই দুঃখিত। পাঠিকাগণ ক্ষমা করিবেন। ন, স।

বন্ধনে বদ্ধ হইতে পারে, তাহাও নির্দ্দিষ্ট আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এস্থলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাবাসী মিরি (পার্ব্বত্য মিরি নহে) জাতির উল্লেখ করিতেছি। মিরি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—বারগাঁ ও দোগাঁ। বারগাঁ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, পিগু এবং ভোরী। পিগুপুরুষের ভোরী রমণী কিম্বা ভোরী পুরুষের পিগু রমণীকে বিবাহ করিতেই হইবে। নতুবা ইহারা কুলভ্রষ্ট হয়। মিরি দিগের মধ্যে বাল্য বিবাহ প্রচলিত নাই। কোন কোন স্থলে অল্প বয়সে বিবাহ স্থির হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত যুবক পৃথক ঘর বাড়ীর সংস্থান করিতে না পারে, সেই পর্য্যন্ত বিবাহ করে না। কোন কোন স্থলে যুবক বিবাহের পর শ্বশুর বাড়ীতে দুই বৎসর কি ততোধিক কাল চাকরী করিয়া উপার্জ্জিত অর্থ শ্বশুরকে পণ স্বরূপ প্রদান করে। তৎপর পৃথক বাড়ীতে চলিয়া যায়। বন জঙ্গল পরিষ্কার, ক্ষেত্র চাস প্রভৃতি সমস্ত কঠিন কাজ পুরুষগণ করিয়া থাকে। স্ত্রীলোক ধান্য রোপণ করে, কাটে, কাপড় বুনে ও অন্যান্য গৃহ কর্ম্ম সম্পাদন করে। কোন উক্তা রমণী পতি বর্ত্তমানে পত্যন্তর গ্রহণ করিলে কিম্বা পর পুরুষে আসক্ত হইলে উক্তা রীতি অনুসারে তাহার প্রাণ দণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে। তৎপর কাছাড়ী (কছারী)* জাতির বিষয় দেখা যাউক। ইহাদিগের বাসস্থান গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দরঙ্গ, প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকাভূমি। ইহাদিগের মধ্যে আমাদের দেশের ন্যায় খোকা খোকির বিয়ে হয় না। কোন ব্যক্তির বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইলে তাহার পিতামাতা পাত্রী অন্বেষণ করিতে থাকে। যদি কোন কন্যা পছন্দ হয়, তবে বরের পিতা মাতা কন্যার পিতা মাতার নিকট তাম্বূল (পান সুপারী) শুকর মদ্য প্রভৃতি উপঢৌকন লইয়া উপস্থিত হয়। যদি পাত্রী পক্ষের কেহ তৎক্ষণাৎ সুপারী কাটিয়া পান খায়, তবেই তাহাদিগের বিবাহের প্রস্তাব স্থির হইল। ইহার পর কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে সকল বন্ধু বান্ধব জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রভৃতি সমবেত হইলে সভাস্থলে বর ও কন্যাকে উপস্থিত করিয়া উক্ত বিবাহে তাহাদিগের সম্মতি আছে কি না জিজ্ঞাসা করা হয়। ইহারা সম্মতি সূচক বাক্য প্রকাশ করিলেই বিবাহ হইল। তৎপর উক্ত নব দম্পতীর মঙ্গল উদ্দেশে ভূতপ্রেত দিগের নিকট মুরগ প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়; এবং নৃত্যগীতাদি ও ভোজ হইয়া বিবাহ ক্রিয়া শেষ হয়। এখানে বলা উচিত যে, যুবকের পিতা কন্যার পিতাকে কিঞ্চিৎ অর্থ পণ স্বরূপ দিয়া থাকেন। পাত্র পক্ষ সেই পণ দিতে অক্ষম হইলে, জামাতা শ্বশুর বাড়ীতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য চাকরী করিতে বাধ্য হয়। স্বামী স্ত্রীর পরস্পর অভিমত হইলে বিবাহ ভঙ্গ (Divorce)

* They have a bold, independent, manly bearing, though in Conversation their manner is apt to be unpleasantly abrup and brusque; and when bent on attaining unlawful ends they do so more commonly by violence and force than by deceit and fraud. One leading feature in their natural type of character is very strongly marked clannish feling which cause them sometimes to stand by and support each other for good or for evil to the last extremity.

Assam Census Report p. 70

হইতে পারে। বিবাহ ভঙ্গ করিতে হইলে এবিষয়ে আত্মীয় স্বজনকে খবর দেওয়া হয়। তৎপর স্বামী একটা পানের এক দিকে ও স্ত্রী অপর দিকে ধরিয়া সভা স্থলে সকলের সমক্ষে টানিয়া দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেই বিবাহ ভঙ্গ হইল। ইহারা পুনরায় ইচ্ছামত বিবাহ করিতে পারে। ইহাদিগের স্বভাব উত্তম; বিবাহ বন্ধন দৃঢ় ও পবিত্র *। মিকির জাতির বিবাহ-প্রণালীও প্রায় কাছাড়ীদিগের ন্যায়। খামতি জাতির মধ্যে মদ্য পান নিষিদ্ধ। এইরূপ আরো কত জাতির উল্লেখ করিতে পারি। তবে কেমন করিয়া বলিব, "উচ্চ জাতি ভিন্ন অন্য জাতির মধ্যে বিবাহ প্রথা নাই বলিলেই ঠিক হয়?" (১) কেমন করিয়া বলিতে পারি, "ব্যভিচার নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে দোষ বলিয়াই গণ্য নহে" * ইত্যাদি।

আমিও এক সময় ব্রহ্মপুত্র বক্ষে ভাসমান উমানন্দের শোভা দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইয়া অবশেষে নীলাচল শিখর-স্থিত ভুবনেশ্বরের মন্দিরের পশ্চাৎদিকে বসিয়া ভাবিতেছিলাম। কত কি ভাব হইয়াছিল; বলিতে পারি না। একটী কথা মনে আছে,—আসামে ভেড়া বানান। একজন আসামী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম— "মহাশয় ভেড়া বানান বিষয়টা কি?" তিনি উত্তর করিলেন—"ভেড়া আবার বানাবে কি? ভেড়ার ছেলেরাই এখানে আসিয়া ভেড়া হয়; এখানে কি মানুষ আসে?" তৎপর আমি নিম্ন শ্রেণীর লোক বেষ্টিত— শর্ম্মার বাড়ীতে ৭। ৮ দিন অবস্থিতি করিয়াছি। আমার নিকট হোমিওপ্যাথী ঔষধ ছিল। ইহাদের অনেকেই এই সংবাদ পাইয়া প্রতিদিন স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া আমার নিকট আসিত। আমিও ইহাদিগের বাড়ীতে যাইতাম। ইহাদিগের শিশু কন্যাগণ আমাকে অনেক সময় পয়সার জন্য বিরক্ত করিত। বলিত "একটা পয়সা দে বাবু, মুগ দে বাবু দে, সন্দেশ খাইব, আশীষ করিব, দে বাবু মুগ একটা পয়সা দে" ইত্যাদি। এই পল্লীস্থিত বিবাহিত ও অবিবাহিত স্ত্রী লোকদের সহিত আলাপ করিয়া ইহাদিগের চরিত্র, রীতি নীতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। একদিনও ইহারা "বাড়ীতে বাড়ীতে বেশ্যা বৃত্তি করে বলিয়া" অনুভব করিতে পারি নাই। পরন্তু যখন ইহাদিগকে সৎ পরামর্শ দিয়াছি, সৎ কথা বলিয়াছি, তখন সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছে "টোর ঘর বঙ্গাল দেশত ন হোবার লগে, টুই বঙ্গাল ন হয়, টুই ভাল" ইত্যাদি (তোমার বাড়ী বঙ্গদেশে নয়, তুমি বাঙ্গালী নও, তুমি ভাল, তুমি ভাল ইত্যাদি) বলা বাহুল্য যে বাঙ্গালী মাত্রকেই "বঙ্গাল" অথবা "কলা (কাল)

---

* "The family relations among Cacharis are on the whole sound and pure and much more as perhaps than in more civilized communities

*Census Report* 1881 *p.* 71.

(১) সমালোচক অনেক জাতির নাম করিয়া অতি কষ্টে দুটী জাতির বিবাহ প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাও যে কিরূপ বিবাহ প্রথা পাঠকগণ বিচার করিবেন। কিন্তু প্রবন্ধকেও ত এক প্রকার বিবাহ প্রথা বলিয়া উল্লেখ করিতে পারিতেন।

* "Among the Cacharis adultery is looked upon as a very serious offence and the adulterer becomes an outcast unless he can pay a heavy fine No blame is attached to the adultress."

*Robinson's Assam, p.* 395.

বঙ্গাল” এবং সাহেব মাত্রকেই “বগা (শালা) বঙ্গাল” বলিয়া থাকে। ইহাদের সকলই যে “বাড়ীতে বাড়ীতে ঐ জঘন্য বৃত্তি করে না, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। * এক দিন ঘরে বসিয়া আছি, পার্শ্বের ঘরে একজন যুবক চুপি চুপি কি বলিল; দুই চারিটা টাকার শব্দও শুনিয়াছিলাম। বৃদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল “এমন কথা বলোনা বাবা, ইজ্জত যাবে।” তার পর বৃদ্ধা রাগান্বিত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াই আমাকে দেখিতে পাইল। দেখিয়া সমস্ত কথা বলিল। বাঙ্গালী যুবক বৃদ্ধার নাতিনীর রূপে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। এই বৃদ্ধা নিম্ন শ্রেণীর শূদ্র জাতীয়া। এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া কিরূপে বলির “বাড়ীতে বাড়ীতে সকলেই ঐ ঘৃণিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে”। আর উক্ত প্রবন্ধলেখক পরের মুখে দুচারিটী কথা শুনিয়াই সমস্ত আসামী-দিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদের দোষ দেশ বিদেশে কীর্ত্তন করিলেন। সমস্ত নিম্ন জাতির উপর কলঙ্ক আরোপ করিলেন। কি ভয়ানক ভ্রম!!

পাশব প্রকৃতি কোন কোন ইংরাজ ও বাঙ্গালী অর্থ দ্বারা আত্মীয় স্বজনকে বশ করিয়া তাহাদের অধীনস্থ কন্যা কি অন্যান্য বয়স্থা স্ত্রীলোককে দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, একথা সত্য। এইরূপ লোক “সম্মানিত„ হওয়া দূরে থাকুক, সচরাচর ঘৃণিত অনাদৃত হইয়া থাকে। টেম্পল্‌টন সাহেবের কথা বোধ করি অবগত আছেন। কোন কোন ইহুদী এরূপ করে বলিয়া জনরব আছে। কোন বাঙ্গালী ও তাহার বিধবা কন্যাকে দুষ্কর্ম্মে রত করিয়াছিলেন। এই জন্য কি এই গুলি জাতীয় কলঙ্ক বলিয়া ধরা যাইতে পারে? একজন বা দুইজন অন্যায় কাজ করে বলিয়া কি বলিব, জাত শুদ্ধ সব লোক এরূপ করিতে পারিলে “সম্মান বোধ করে।” লেখকের এইরূপ উক্তি অতি সঙ্কীর্ণতা পরিচায়ক।

২। “আসামের অধিকাংশ স্থলে প্রকাশ্য বেশ্যা নাই, তাহার কারণ ভদ্র পরিবার ভিন্ন বাড়ীতে বাড়ীতে সকলেই ঐ ঘৃণিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে।” * এরূপ লিখাকেই বলে Libellous!!! এজন্য লেখকের উচিত প্রত্যেক কৃষক ও কৃষক-রমণীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সকলেই এই রূপ করে?—দেশ শুদ্ধ লোকের কথা দুই দিনে কি রূপে জানিলেন? না জানিয়া সব ছোট লোকদের উপর এমন অপবাদ! কেহ কেহ এরূপ করে বলিলেও কতকটা যুক্তি যুক্ত হইত। ইহাকেই বলে মিথ্যা অপবাদ করা। † বঙ্গদেশের সব পল্লীতেই বেশ্যা আছে না কি? লেখকের যুক্তি বলে দেখিতেছি কয়েকটী সহর ভিন্ন সমস্ত বঙ্গদেশ রসাতলে যায়। তবে কি আসামে ব্যভিচার নাই? এখানে বলিয়া রাখি, আসামে স্ত্রী স্বাধীনতা ছিল এখনও আছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মিরজুমলা প্রমুখ মুসলমান সৈন্যগণ আসামে প্রবেশ করিয়া দেখিল, স্ত্রীলোকগণ আর ঘোড়া

* কিন্তু অনেকে যে করেনা ইহা কি তারিণী বাবু বলিতে পারেন? সকলে করে ইহা লেখা অন্যায় হইয়াছে স্বীকার করি, লেখকের এই অনবধানতার জন্য আমার ক্ষমা প্রার্থনা করি।

*আবার কেন? ন, স।

† তারিণী বাবু এস্থলে সহর কসবে আসিয়াছে তাহাই লিখিয়া ফেলিয়াছেন। ন, স।

বেষ্টিত অন্তঃপুরে বাস করে না ; যথা ইচ্ছা তথা বিচরণ করে। তখন হইতে মুসলমানগণ তাহাদিগের প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার করিয়া চরিত্রের হীনতা সম্পাদন করিতেছিল। তার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রহ্মদেশ হইতে মানগণ আসিয়া আসামীদিগের কি না দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছিল? এদিকে তখন আবার ইংরেজ সৈন্যগণ আসামে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তখন হইতেই আসামে এক ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। আসামে সমাজ ভিত্তি স্খলিত হইল—নৈতিক উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত হইল।* তখন হইতেই আসামবাসী হীনতেজ, হীনবীর্য্য হইয়া দিনপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। "দেশার্থং দেহমুৎসৃজেৎ" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পুরুষগণ পতঙ্গের ন্যায় বিপ্লবাগ্নিতে ঝাঁপ দিলেন। এদিকে পতি পুত্রহীন মাতা, স্বামীহীন স্ত্রী, ভ্রাতাহীন ভগিনীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে মানদিগের অত্যাচারে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা আসামে অসম্ভাবিত রূপে বৃদ্ধি হইয়া গেল। তখন হইতেই আসামে বিবাহ-বন্ধন শ্লথ, বিবাহ-পদ্ধতি হীন হইয়া পড়িয়াছিল এবং এখন ও তদানুষঙ্গিক কতকগুলি কুৎসিত নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সেই বিপ্লবের ভস্মরাশি এখনও স্তূপাকারে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই রূপে যে সকল জাতি যত অধিক পরিমাণে দেশী ও বিদেশী সৈন্য ও মান প্রভৃতি অত্যাচারীদিগের সংঘর্ষণে আসিয়াছিল, তাহাদের নৈতিক অবনতি তত অধিক পরিমাণে হইয়াছে। দুশ্চরিত্র ইংরাজ ও বাঙ্গালী, পশু প্রকৃতি দেশী ও বিদেশী সিপাহীদিগের ঔরষ জাত সন্তান সন্ততি যে ব্যভিচারী হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? বঙ্গদেশে যেমন ব্যভিচারী মাতা সন্তানকে পরিত্যাগ করে, অথবা মারিয়া ফেলে, আসামে তেমন নিয়ম নাই। ইহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। সুতরাং কোন শ্রেণী বিশেষের দোষ দেখিয়া আমরা তাহা সমস্ত জাতিতে আরোপ করিতে পারি না। অপিচ কোন শ্রেণীর কি কোন জাতির ব্যবসা ইহাদিগকে ক্রমে ক্রমে কুপথে প্রচারিত করিতেছে। যেমন ব্যবসায়ী গায়ক গায়িকা, নর্ত্তক নর্ত্তকী, এবং অভিনায়ক অভিনায়িকা প্রভৃতি। এখানকার মেথরগণ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী; খাসিয়ানগণ সে জন্য কি বলিবে উক্ত দেশবাসী সকল লোকই মেথর জাতীয়? ইহা যেমন ভুল, উক্ত প্রবন্ধ লেখকের "নট নটী" প্রভৃতি অতি অল্প সংখ্যক লোকের দোষ কিম্বা ব্যবসায় সকল জাতিতে আরোপ করাও তেমন ভুল হইয়াছে। পরন্তু এদেশে স্ত্রী স্বাধীনতা আছে বলিয়া ইহাদিগের দোষ গুলি অতি সহজেই সাধারণের নিকট ধরা পড়ে। বঙ্গদেশে অন্তঃপুরে কত কিছু হয়; অন্য দেশীয় লোকের সহজে তাহা জানিবার সাধ্য কি? তার উপর আবার সহরের স্ত্রী লোক দেখিয়া সমস্ত স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সেই মত পোষণ করা অতি প্রমাদজনক। যদি চিৎপুর রোডের কিম্বা সোণাগাছীর অবস্থা দেখিয়া বঙ্গীয় স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কেহ সেই মত পোষণ করে, তবে কেমন হয়? ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকাস্থিত হাজু নামক স্থানকে বর্ত্তমান বেবিলন বলিলেও অত্যুক্তি হয়

* "Such intercourse has nearly every where corrupted the manners of the natives."
*Oscerpeschel's races of man p. 229.*

না। বেবিলনে যে সকল পাশবক্রিয়া মোক্ষপ্রদ বলিয়া সম্পাদিত হইত, হাজুতে সেই গুলি মোক্ষপ্রদ না হইলেও বড় একটা পাপ বলিয়া পরিগণিত হয় না। হয়গ্রীব মহাদেবের কুমারী স্ত্রীগণ ও নর্ত্তকীগণ কি না করিতে পারেন! এজন্য কখনই বলিতে পারি না আসামের সর্ব্বত্রই এই প্রকার—আসামে নিম্ন শ্রেণীর সকল লোকেই নিতান্ত অধম নীতিহীন বর্ব্বর। সমস্ত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কথা দূরে থাকুক, কেবল মাত্র হাজুর নিম্ন শ্রেণীস্থ সকলেই "বাড়ীতে বাড়ীতে এই বেশ্যা বৃত্তি করিয়া থাকে" বলা ও নিতান্ত অন্যায়। * আসামে ভালও আছে মন্দ ও আছে। তবে দুই এক স্থানে মন্দের ভাগ অধিক।

৩। "স্ত্রীলোকে উপার্জ্জন করে পুরুষেরা ঘরে বসিয়া খায়।" পার্ব্বত্য অসভ্য বা অর্দ্ধ সভ্য জাতিদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে ইহাদের স্ত্রী পুরুষ সমান পরিশ্রম করে। য়ুরোপীয় সভ্যতর জাতির ন্যায় স্ত্রীকে মঞ্চে বসাইয়া পাদ্য অর্ঘ প্রদান করে না—যেমন আমাদের দেশেও কতক পরিমাণে হইতেছে—আবার নিতান্ত বর্ব্বরের ন্যায় স্ত্রীর দ্বারা সমস্ত কাজ করায় না। আসামের ১৮৮১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে এরূপ লিখিত আছে†। শতকরা ৬১.৫ জন পুরুষ নিজ নিজ পরিশ্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পুরুষ সংখ্যার মধ্যে শতকরা ৪১.৯ জন ১৫ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক, সুতরাং দেখা যায় যে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি মাত্রেই নিজ নিজ পরিশ্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শতকরা ৩৩ জন পুরুষের ন্যায় কর্ম্ম করে। ইহা দ্বারাই উপরোক্ত কথাটি কত দূর সত্য তাহা প্রমাণিত হইতে।*

৪। আসামে আমাদের দেশের ন্যায় আতিথ্য প্রথা না থাকায় কয়েকটা কারণ পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ মিকির প্রভৃতি জাতির গ্রামে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইবে এক এক পরিবারের সমস্ত লোকের জন্য এক খানি মাত্র ঘর। বাড়ীর সকলেই সেই ঘরে রাত্রি যাপন করে ও আহারাদি করিয়া থাকে। তাহাতে আবার ইহারা নিতান্ত দরিদ্র অবস্থাপন্ন। বঙ্গ দেশের কৃষকদিগের ন্যায় সুখ সচ্ছন্দে বাস করে না। দ্বিতীয়তঃ অনেক দুষ্ট লোক ইহাদিগকে প্রতারণা করিয়াছে বলিয়া ইহারা এখন আর কাহাকেও স্থান দিতে চায় না। তৃতীয়তঃ হিন্দু সন্তান যেমন মুসলমানকে অন্তঃপুরস্থিত ঘরে স্থান দিতে চায় না, তেমনি হিন্দু আসামীগণ ধর্ম্মের অনুরোধে বাঙ্গালী প্রভৃতিকে আশ্রয় দেয় না। হিন্দু আসামিগণ এত দূর গোড়া যে, বাঙ্গালী প্রভৃতি জাতিকে জল-পান করিবার জন্য বাটী, গ্লাস প্রভৃতি দেওয়া দূরে থাকুক, বসিবার কাষ্ঠাসন পর্য্যন্ত দেয় না। বসিবার জন্য খড় দিয়া থাকে। "গুপ্ত প্রেমের দ্বার খুলিলে" ও হিন্দু আসামী তাহার বাসঘরে প্রবেশ করিতে দিবে না—তাহার বাসনে আহার করিতে দিবে না।'†। তবে আর কি প্রকারে "দ্বার অবারিত?" চতুর্থতঃ ইহাদের অনেকেই জঙ্গলে বাস করে।

* এখানে ও ঐ এক কথা? ন, স

† See p. 115 Assam Census Report.

* এই তুলনায় গণনা সমস্ত আসামবাসীর সংখ্যানুসারে হইয়াছে। কেবল নিম্ন শ্রেণি সম্বন্ধেই ঐরূপ কথা বলা হইয়াছে। ন, স।

† They are also hospitable to people of their own caste but to no others."
*Robinson's Assam p. 267.*

এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রাম অনেক দূর। কোন এক গ্রামের হাট হইতে সপ্তাহের খাদ্য ক্রয় করিয়া রাখে, ইহাতেই তাহাদের সেই কয়েক দিন চালাইতে হইবে। তাহাতে ইহারা নিতান্ত গরিব।* অতিথিকেই বা দিবে কি, নিজেই বা খাইবে কি? তবে কোন ব্যক্তি নিতান্ত নিরাশ্রয় হইলে গ্রামস্থিত "নাম ঘরে" (উপাসনা-লয়ে) তাহাকে স্থান দেওয়া হয়।

আমরা আর্য্য জাতির বংশধর হইয়া যদি কুরীতি কুনীতি পূর্ণ দেবদেবীর অর্চনা করিতে পারি, তবে আসামী "ধর্ম্মহীন" এ কথা আর কলঙ্কের বিষয় কি? ইহারা পর্ব্বতবাসী অসভ্য। ইহাদের কোন কোন জাতি এখনও মনুষ্যের আদিম পিতৃপুরুষ-দিগের ন্যায় অতিহীন ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। কয় জন ধর্ম্ম প্রচারক ইহাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য বর্ষে বর্ষে আসিয়া থাকেন? নিম্ন শ্রেণীর সকলই ধর্ম্মহীন, এ কথাই বা কেমন করিয়া বলি। বঙ্গদেশে যেমন চৈতন্য, আসামে তেমন শঙ্করদেব। শঙ্করের পবিত্র ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ মলিন হইয়াছে সত্য, কিন্তু আসাম-বাসী সকলেই ধর্ম্মহীন এ কথা বলিতে পারি না। অনেক স্থানে গ্রামস্থিত "নাম ঘরে" নাম কীর্ত্তন হইয়া থাকে, কোন কোন স্থলে জঘন্যতাও দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কি অতি অশ্লীলতা পূর্ণ কিশোরী ভজন নাই? এজন্য কি বলিতে পারি বঙ্গদেশ শুদ্ধ সব বৈষ্ণবই ধর্ম্মহীন?

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দক্ষিণ পূর্ব্বাংশ নিবাসী খামতিগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু ইহারা গোমাংস ভিন্ন অন্যান্য মাংস ভক্ষণ করে। ইহাদের মধ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ। ইহাদের পুরোহিত মদ্য মাংস ভক্ষণ করিতে পারে না। মস্তক মুণ্ডন করিয়া গৈরিক পরিধান করত গ্রামের বহিস্থ "বাপুচঙ্গে" (ধর্ম্ম মন্দিরে) বাস করে। গ্রামস্থিত স্ত্রী পুরুষ তাহার আহারার্থ নানা প্রকার দ্রব্য ও পূজার জন্য ফুলের মালা প্রভৃতি উপ-হার দিয়া থাকে। 'বাপুচঙ্গে' বুদ্ধের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং কেবল মাত্র পুষ্প দ্বারা তাঁহার পূজা করে। প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধ মূর্ত্তির নিকট কোন প্রকার বলি প্রদান করে না।

আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। ভাই, আসামবাসীর দোষ ঘোষণা করিয়া কি আরো বিদ্বেষানল বৃদ্ধি করিতে চাও! সকলেরই দোষ আছে; কাহারও অধিক কাহারও অল্প। দোষ জানিয়া কাহারও কিছু লাভ নাই; গুণ জানিলে বরং তাহা অনেকে অনুকরণ করিতে পারেন। যাহাতে আসাম উন্নত হইতে পারে তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।* বৎসর বৎসর এখানে আসিয়া ধর্ম্ম প্রচার করুন; দেখিবেন বঙ্গদেশ অপেক্ষা এখানে ধর্ম্ম প্রচার কত সহজ; দেখিবেন, অসভ্যেরা একবার ধর্ম্মের কথা শুনিলে কেমন সুসভ্য হইয়া পড়ে। বুঝিতে পারিবেন আসামে ধর্ম্মের আদর হয় কি না।

শ্রীতারিণীচরণ নন্দী। শিলং।

---

* আতিথ্য প্রথা না থাকার অনেক কারণ আছে, সে সকল উক্ত প্রবন্ধের আলোচ্য ছিল না। ন, স।

* তারিণী বাবু ঠিক বলিয়াছেন। কিন্তু অভাব না জানিলে অভাব দূর করিতে কে অগ্রসর হয়? আসামের অভাব জ্ঞাত করিয়া প্রবন্ধ-লেখক কি সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র হন নাই? বাঙ্গলার বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা প্রভৃতির দোষ উল্লেখ করিয়া এপর্য্যন্ত যাঁহারা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাঁহারা কি নিন্দার কার্য্য করিয়াছেন? ন, স।

# চৈতন্য চরিত ও চৈতন্য ধর্ম।

## উপক্রমণিকা।

আজকাল এদেশে ধর্ম বিষয়ে নানা প্রকার আলোচনা চলিতেছে। সহরে, পল্লিগ্রামে, নগরে, উপনগরে, যেখানে যাই সেইখানেই দেখি সাকার, নিরাকার, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, উপাসনা প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় সকল উৎসাহের সহিত আলোচিত হইতেছে। স্কুলের ছাত্রদিগের মুখেও এখন ঈশা, মুসা, নানক, কবির, শাক্য, চৈতন্যাদি ধর্ম্মবীরগণের ধর্ম্মজীবনের গূঢ়তত্ত্বের অতি উচ্চ উচ্চ কথা সকল শুনা যাইতেছে। শুধু বঙ্গদেশে কেন, সমস্ত ভারতবর্ষে এবং ভারত সীমা অতিক্রম করিয়া সুদূরস্থিত সভ্যতম ইউরোপেও ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী মহা আন্দোলন চলিতেছে। ইউরোপের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা মানব জীবনের প্রহেলিকা ও ঈশ্বর তত্ত্বের মূলান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া গভীর চিন্তা ও গবেষণা পূর্ণ গ্রন্থ নিচয় জগৎকে উপহার দিতেছেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া প্রত্যেক ঈশ্বর বিশ্বাসীর মনে বড় আশার সঞ্চার হয় যে, বুঝিবা এই দুঃখময় অবিশ্বাসী জগতে বিশ্বাস রাজ্য স্থাপিত হইবার দিন আগত-প্রায়। যে সকল নাস্তিক ও সন্দেহবাদীগণ বলিয়া থাকেন যে, জ্ঞানালোচনার সঙ্গে সঙ্গে এমনদিন আসিবে যখন ভগবানের নাম পর্য্যন্ত মানবীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে চির দিনের মত বিদায় গ্রহণ করিবে, বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্মান্দোলন বাস্তবিকই তাঁহাদের কথার অলীকতা প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। সুবিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত হারবার্ট স্পেনসার তাঁহার Ecclesiastical institution নামক গ্রন্থে এক্ষণে একথা স্পষ্টরূপে স্বীকার করিতেছেন যে, ভগবানের অস্তিত্ব ও উপাসনা যে কেবল চিরকাল মানব মনে অঙ্কিত থাকিবে তাহা নহে, আমরা যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিব, ততই উপাসনার ভাব পরিপুষ্ট হইতে থাকিবে। উপাসনাকে তিনি ঐশীভাবের সঙ্গীতময় উচ্ছ্বাস (musical expression of sentiments) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন "That a sphere will exist for those who are able to impress their hearers with a due sense of the mystery which enshrouds the universe, and that *musical expression to the sentiment accompanying this sense will not only survive but will undergo further development.* ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ যুগান্তর উপস্থিত না হইলে, আমরা অদ্য যে প্রস্তাবের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতে সাহসী হইতাম না।

এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত শ্রেষ্ঠ চৈতন্যদেব উনবিংশ শতাব্দীর সভ্য সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি সভ্য জগতে এক প্রকার রাজত্ব করিতেছেন বলিলেও মিথ্যা বলা হয় না। এখন আর সেকালের ন্যায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও ভক্তি শাস্ত্রের কথা শুনিলে কাহাকেও উপহাস করিতে শুনা যায় না। কিন্তু ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বের শিক্ষিত সম্প্রদায়

ইহা কখন বিশ্বাস করিতে পারিতেন না যে, শিখাকণ্ঠীধারী স্থূলকায় বাবাজীদের শাস্ত্রে আবার শিখিবার যোগ্য জিনিষ কিছু আছে, অথবা এমন কিছু আছে যাহাতে মানুষের পরিত্রাণের পথে সহায়তা করিতে পারে? কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে সে দিন চলিয়া গিয়াছে; আজকাল ধর্ম্মযাজকগণ বৈষ্ণব শাস্ত্রের সার উদ্ধার করিয়া সাধারণে প্রচার করিতেছেন, ধর্ম্ম মন্দিরের বেদী হইতে প্রেম, ভক্তি, ভাব, মহাভাব সম্বন্ধে উপদেশ সকল প্রদত্ত হইতেছে, বৈষ্ণব সাধুগণের জীবনের জলন্ত বৈরাগ্য ও প্রেমের কথা সংবাদ পত্রে নিনাদিত হইতেছে, এবং বৈষ্ণব গ্রন্থের মর্ম্ম সকল গৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। তাই বলিতেছিলাম যে, এ সময়ে চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলিলে কেহ উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিবেন না।

যদিও ভক্ত চূড়ামনি শ্রীচৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম সম্পর্কীয় অনেক বিষয় সভ্য জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি এমন অনেক কথা আছে, যাহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, অথবা যাহা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ রূপে হয় নাই। বিশেষত তাঁহার সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে, আমাদিগের মতে তদ্দ্বারা তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অতি অল্পই পাওয়া যায়। কেন না, এক্ষণকার পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে বসিয়া সুমার্জ্জিত রুচির সহায়তায় তাঁহার চরিত্র চিত্রিত করিতে গেলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভবনা অতি অল্প। সে জন্য আমরা এই প্রবন্ধে এই বঙ্গীয় ধর্ম্ম সংস্কারক ও ধর্ম্মবীরের চরিত্র নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করিব, মনে করিতেছি। ইহাতে আমাদের নিজের সিদ্ধান্ত অতি অল্পই থাকিবে। তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের উক্তি অনুযায়ী নিঃসন্দিগ্ধরূপে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়, তাহারই উপর আমরা বিশেষ নির্ভর করিব।

শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মজীবনের বিকাশ, পরিপুষ্টি ও পরিণতিও যাহা, ভক্তিশাস্ত্রের বিকাশোন্নতিও তাহাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না; সুতরাং পাঠক মহাশয় মনে করিয়া লইতে পারেন যে, বৈষ্ণবীয় ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনাও এ প্রস্তাবের এক প্রধান উদ্দেশ্য। "বৈষ্ণবীয় ভক্তি শাস্ত্র" অর্থে আমরা চৈতন্য-প্রণোদিত ভক্তিকেই নির্দ্দেশ করিতেছি। ইহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এদেশে ভক্তি বিষয়ে কোন আলোচনা হয় নাই। বাস্তবিক ঘটনা এরূপ নহে। কারণ চৈতন্য জন্মিবার বহুপূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে এবিষয়ে যথেষ্ট আন্দোলন হইয়াছিল। পৌরাণিক সময়ের অভ্যুদয় কালে ভক্তিপ্রবণ ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবৎ ও অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থে, তাহার পরে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব সময়ে বা কিছু পরে বৌদ্ধধর্ম্মের তীব্রগতি প্রতিরোধের জন্য রামানুজস্বামী, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক, তৎপরে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি ও জয়দেব গোস্বামী দ্বারা, এবং অবশেষে মাধবেন্দ্রপুরী অদ্বৈতাচার্য্য ও যবন-কুল তিলক হরিভক্ত হরিদাস ঠাকুর কর্ত্তৃক এ শাস্ত্র আলোচিত ও শুধু তাহা নহে, স্বয় জীবনে সংসাধিত হইয়াছিল। তবে চৈতন্যের প্রব-

স্তিত ভক্তি ও প্রেম ইঁহাদের প্রেমভক্তি হইতে যে অনেকটা ভিন্ন ছিল, তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইবে।

নানাবিধ অত্যুক্তি ও রূপকালঙ্কারের মধ্য হইতে চৈতন্যদেবের ধর্ম্মমত সকল নির্ব্বাচন করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। একে তাঁহার নিজের রচিত গ্রন্থ বা পদাবলী অতি বিরল, তাহাতে আবার তাঁহার অনুচরবর্গ তাঁহাকে যে ভাবে দেখিতেন, তাহাতে তাঁহার সামান্য সামান্য কার্য্য পরম্পরাকেও তাঁহারা স্বয়ং ভগবানের কার্য্য বলিয়া অদ্ভুত ও অতিরঞ্জিত ভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং চৈতন্য জীবনের প্রকৃত ঘটনা নির্ব্বাচন করা যে বড় সহজ হইবে না, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ভারতীয় ইতিহাসের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় ইহার ঘটনাপুঞ্জ দুষ্প্রাপ্য নহে। বৈষ্ণবেরা তাঁহার জীবনের ও ধর্ম্ম মতের প্রায় সমস্ত ঘটনাই বজায় রাখিয়াছেন, কেবল তাহার অনেক স্থলে অলৌকিক অত্যুক্তিতে আচ্ছন্ন করিয়াছেন মাত্র।

দ্বিতীয়ত চৈতন্যের সাক্ষাৎ অনুচর অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতেন, তাঁহার কার্য্য কলাপ দেখিতেন ও উপদেশ শুনিতেন, তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থ অতি অল্পই দেখা যায়। যাঁহারা তাঁহার জীবনবৃত্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য বা অনুশিষ্য ছিলেন না। তাঁহার তিরোভাবের অনেক পরে অর্থাৎ যখন চৈতন্যের অবতারত্ব একরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখনই এই সকল গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। সুতরাং এবিষয়ে আমরা প্রথম শ্রেণীর প্রমাণ অতি অল্পই দেখিতে পাইব; দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রমাণের উপরই অধিক নির্ভর করিতে হইবে।

চৈতন্যদেবের নিজের বাক্যকেই আমরা প্রথম শ্রেণীর প্রমাণ বলিতেছি। তাঁহার কার্য্য কলাপ পরিদর্শন ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া যে সকল লিপি গ্রথিত হইয়াছে, তাহাকে আমরা দ্বিতীয়শ্রেণীর প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিব। ব্যবস্থা শাস্ত্রের বিধান মতে ইহা যদিও প্রথম শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে; কিন্তু দর্শক ও শ্রোতাদিগের নিজ নিজ মনের ভাব, ও ভাবব্যঞ্জক বর্ণনা, বক্তা ও অনুষ্ঠাতার ভাবের সহিত এরূপ ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, কোন্‌টী কাহার, তাহা বাছিয়া লওয়া দুষ্কর। সে জন্য আমরা এখানে প্রমাণ শাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্ঘন করিতে বাধ্য হইলাম। ভরসা করি, ব্যবস্থা শাস্ত্র বিশারদ পাঠক ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ হইতেও চৈতন্যের সাক্ষাৎ শিষ্য প্রশিষ্যের বাচনিক শ্রুত হইয়া যে সকল গ্রন্থ রাশি রচিত হইয়াছে, তাহাই আমাদের মতে তৃতীয় শ্রেণীর প্রমাণ।

"আদি লীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত,
সূত্ররূপে মুরারী গুপ্ত করিলা গ্রথিত।
প্রভুর মধ্য শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর
সূত্র করি গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর।
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া।"

চৈতন্য চরিতামৃত।

"বেদগুহ্য চৈতন্য চরিত কেবা জানে?
তাহা লিখি যেই শুনিয়াছি ভক্ত স্থানে।"

চৈতন্যভাগবত।

এক্ষণে আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের

অনুসরণ করিতেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে চৈতন্য চরিত্র নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কোন্ কোন্ প্রামাণ্য গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, তদ্বিষয় সমালোচনা হইবে।

## চৈতন্যচরিত্র নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কি কি প্রামাণ্য গ্রন্থ পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, চৈতন্যদেবের স্বপ্রণীত গ্রন্থ বা আনুপূর্ব্বিক পদাবলী পাওয়া যায় না। কেবল এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত গুটী কয়েক সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গলা পদাবলী যাহা তাঁহার মুখ-বিনির্গত বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে গৃহীত হইয়া আসিতেছে, তদ্দ্বারা তাঁহার চরিত্র সম্পর্কীয় সর্ব্বাঙ্গীণ ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করা যাইতে পারে না। কারণ তত্তৎ শ্লোক বা পদ বিশেষ বিশেষ ভাবে অনুভাবিত হইয়া বিশেষ বিশেষ সময়ে উচ্চারিত হইত, সুতরাং সমস্ত জীবনের ঘটনাবলীর পরিচায়ক বলিয়া তাহাকে সমর্থন করা উচিত নহে। তবে তদ্দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মভাবের অনেক তত্ত্ব পরিষ্কার রূপে বুঝা যায়। এইরূপ কয়েকটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

নাম সঙ্কীর্ত্তনকে তিনি ঈশ্বর সাধনের পরম উপায় মনে করিতেন। তদ্বিষয়ে তাঁহার উক্তি এই—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণেন কালঃ
এতাদৃশী তবকৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহা জনিনানুরাগঃ।"

হে ভগবন্ আমাদের উপর তোমার এমনি কৃপা যে, তোমার নামেতে তুমি তোমার সর্ব্ব শক্তি বহুপ্রকারে অর্পণ করিয়া রাখিয়াছ এবং ঐ নাম স্মরণের জন্য সময়ও নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছ; কিন্তু আমার এরূপ দুর্দ্দৈব যে এমন নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না।

যেরূপে ভগবানের নাম লইলে প্রেম ভক্তি উৎপন্ন হয় তৎসম্বন্ধে উক্তি।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিবসহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন, কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

তৃণের ন্যায় নীচ ও বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া সর্ব্ব প্রকার অভিমান ত্যাগ করত হরি নাম কীর্ত্তন করিবে।

প্রার্থনা বিষয়ে তাঁহার উপদেশ, যথা

"ন ধনং, ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকীত্বয়ি।"

হে জগদীশ! আমি ধন, জন, সুন্দরী স্ত্রী বা পাণ্ডিত্য এ সব কিছুই যাচ্ঞা করিতেছি না, আমার জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

কিরূপ বাহ্য লক্ষণ হইলে প্রকৃতরূপে ভগবন্নাম গ্রহণ করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, স্থানান্তরে তিনি তাহা প্রার্থনা বাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা—

"নয়নংগলদশ্রুধারয়াবদনংগদ্গদারুদ্ধয়াগিরা
পুলকৈর্নিচিতংবপুঃকদাতব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি।"

হে প্রভো! তোমার নাম গ্রহণে কবে আমার নয়ন যুগল হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে থাকিবে; গদ গদ বাক্যে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিবে; এবং পুলকে সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইবে।

ঈশ্বর বিরহে তাঁহার কীদৃশ অবস্থা ঘটিত, তাহা পশ্চাল্লিখিত শ্লোক পাঠে জানা যায়।

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেন মে"

গোবিন্দ বিরহে আমার নিমেষ কাল যুগের ন্যায় প্রতীয়মান হয়; বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় চক্ষু হইতে বারিধারা পতিত হয় এবং সমস্ত জগৎ শূন্য বোধ হয়।

সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে প্রেমে বিভোর হইয়া এই পদটী এক সময় গাইয়াছিলেন।

"সেই ত পরাণ নাথ পাইনু,
যাঁহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু।"

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রমাণের মধ্যে কড়চা গ্রন্থ গুলিই প্রধান। এক্ষণে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সভ্য সমাজে দৈনন্দিন বিশেষ বিশেষ ঘটনার ডাইরি ও স্মৃতি লিপি (Memorandum) রাখার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে কন্থাকরঙ্গধারী অসভ্য বা অর্দ্ধ সভ্য বৈষ্ণব সমাজে যে ঐ প্রথা প্রচলিত থাকিবে, ইহা সামান্য বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। অনেক পাঠক হয় তো মনে করিতে পারেন যে, এরূপ বলা কেবল বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষার আবিষ্কার মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক ঘটনা এই যে, শ্রীচৈতন্যের শিষ্য ও অনুচরগণের মধ্যে স্মৃতিলিপি রাখার প্রথা বহুল রূপে বিদ্যমান ছিল। এই রূপ স্মৃতিলিপিকে তাঁহারা কড়চা গ্রন্থ বলিতেন ও রচয়িতার নামানুসারে তাহার নামকরণ হইত। যথা;—রূপ গোস্বামীর কড়চা, স্বরূপ দামোদরের কড়চা ইত্যাদি। অনুমান হয়, কড়চা নামটী পারস্য ভাষার জমিদারী কাগজ বিশেষের নাম হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। এক্ষণেও জমিদারী সেরেস্তায় একটী কাগজ প্রচলিত আছে, তাহার নাম কড়চা কাগজ; ঐ কাগজে প্রতি প্রজার জমি ও তাহাদের জমার পরিমাণ ও যত টাকা যে যে সময়ে উসুল দিয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে; তাহা দৃষ্টি মাত্রেই বলা যাইতে পারে যে, ঐ প্রজার জমি জমা কত ও তাহার নিকট কত টাকা বাকী আছে। যাঁহার জলন্ত ধর্ম্মভাব হইতে ধর্ম্ম জগতে কত নূতন নূতন তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে; ও তৎকালের সাহিত্য ও সমাজ সংস্কারের জন্য যিনি কতই অভিনব উৎকৃষ্ট রীতি চালাইয়া ছিলেন, সেই পণ্ডিতাগ্রগণ্য চৈতন্যদেব যে পারস্য ভাষা হইতে এই কড়চা নামটী গ্রহণ করিয়া তাহা অন্য ভাবে প্রবর্ত্তিত করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

উপরি উক্ত কড়চা গ্রন্থে চৈতন্যের সাক্ষাৎ শিষ্য ও ভক্ত মণ্ডলী আপন আপন রুচি, বিশ্বাস ও জ্ঞানানুসারে তাঁহার কার্য্য বিবরণ,উপদেশ ও আচার আচরণ, পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিয়া রাখিতেন এবং সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা তন্মধ্যে বহু পরিমাণে সংস্কৃত শ্লোকও রচনা করিয়া রাখিতেন। রূপ গোস্বামী ও জীব গোস্বামীর কড়চায় সংস্কৃতের ভাগ অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। রূপ, সনাতন ও জীব সর্ব্বদা পুরুষোত্তমে চৈতন্যের নিকট বাস করিতেন না সত্য; কিন্তু তথাপি তাঁহারা কড়চা লিখিতে অমনোযোগী ছিলেন না। চৈতন্যের সাঙ্গোপাঙ্গ সকলেই তাঁহাকে স্বয়ং কৃষ্ণের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের প্রণীত কড়চা সকলও সেই ভাবে পূর্ণ রহিয়াছে।

এসম্বন্ধে মহর্ষি ঈশা ও ভক্তশ্রেষ্ঠ চৈত-

ষ্টের জীবনেতিহাস অতি আশ্চর্য্য রূপে ঐক্য। জন, মথি, লুক প্রভৃতি খ্রীষ্টীয়াচার্য্যগণ ঈশার সমসাময়িক থাকিয়া যেরূপে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা সকলেই যোগীশ্রেষ্ঠ ঈশাকে স্বয়ং ব্রহ্ম, দেবনন্দন রূপে পৃথিবীর পাপীগণের উদ্ধার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, বলিয়া যেরূপে বিশ্বাস করিতেন, ভগবদ্ভক্ত চৈতন্য সম্বন্ধে পঞ্চদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবাচার্য্যগণও ঠিক তাহাই করিয়াছেন। উভয় স্থলেই গ্রন্থকারগণ প্রকৃত ঘটনার সহিত এত অলৌকিক ও অদ্ভুত ঘটনাবলী চিত্রিত করিয়াছেন যে, সময়ে সময়ে তাহা হইতে সত্য নির্ব্বাচন করা অসম্ভব হইয়া উঠে। অথচ এই সকল ব্যক্তি অতি জ্ঞানী ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য অপ্রত্যয় করাও কঠিন। সাধারণতঃ আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, কি খ্রীষ্টীয়ানাচার্য্যগণ কি বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গ কেহই ইচ্ছা পূর্ব্বক অসত্যকে আশ্রয় দেন নাই। মহীয়সী ক্ষমতা-সম্পন্ন ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের প্রতি সাধারণের অবিচলিত ও দৃঢ় বিশ্বাস নিবন্ধন দুর্ভাগ্য ক্রমে ধর্ম্ম জগতে এরূপ ঘটনা বিরল নহে।

মুরারিগুপ্ত নামক নবদ্বীপবাসী জনৈক পণ্ডিত চৈতন্যের বাল্যসখা ও সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনি প্রথম হইতেই বৈষ্ণব ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর চৈতন্যদেব সর্ব্ব প্রথমে যে সকল বন্ধুর নিকট আপন ধর্ম্মভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনিও একজন। চৈতন্যের আদিলীলা বিষয়ে তিনি এক কড়চা লিখিয়াছিলেন; এই কড়চাতে গৌরাঙ্গের জন্ম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা সূত্র অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত রূপে বর্ণিত আছে। পরবর্ত্তী সময়ে চৈতন্যমঙ্গলরচয়িতা বৃন্দাবন দাস প্রধানত ইহাই অবলম্বন করিয়া স্বীয় গ্রন্থ লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

"আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত
সূত্ররূপে মুরারীগুপ্ত করিলা গ্রথিত।"

চৈতন্য চরিতামৃত।

শেষাবস্থায় চৈতন্যদেব নীলাচলে বাস করিতেন। স্বরূপদামোদর নামক শিষ্য তখন সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতেন। তাঁহার কড়চাই শেষ জীবনের প্রামাণিক গ্রন্থ। চৈতন্য চরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহা হইতেই অধিকাংশ ঘটনা আপন পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

"প্রভুর মধ্য, শেষ লীলা স্বরূপদামোদর
সূত্ররূপে গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর।
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া।"

চৈতন্য চরিতামৃত।

এই শ্রেণীর প্রমাণের মধ্যে আরও কতকগুলি গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর-প্রণীত সংস্কৃত চৈতন্যচরিত প্রধান। কিন্তু কবিকর্ণপুরের প্রাপ্ত যৌবন হইতে না হইতে চৈতন্যের তিরোভাব হয়। সুতরাং তৎপ্রণীত গ্রন্থ তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যেই পরিগণিত।

তৃতীয় শ্রেণীর প্রমাণ অর্থাৎ শ্রুতিমূলক যত গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বৃন্দাবন দাস কৃত চৈতন্যভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত চৈতন্য চরিতামৃত ও লোচন দাস কৃত চৈতন্য মঙ্গলই প্রধান। তদ্ভিন্ন রূপগোস্বামী, জীবগোস্বামী ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বহুবিধ গ্রন্থ

ও পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে সমুদয় চৈতন্যের অবতার সংস্থাপন ও কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে যত, তত তাঁহার জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে নহে। অতএব সে সমুদয় গ্রন্থের বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

চৈতন্যের স্বর্গারোহণের পর সর্ব্ব প্রথমে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব বৃন্দাবন দাস চৈতন্য মঙ্গল নামে এক বিস্তৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বৈষ্ণব সমাজে প্রকাশ করিলেন। বৃন্দাবন দাসকে বৈষ্ণবেরা ব্যাসের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

"কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস;
চৈতন্য চরিতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল;
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল।"
চৈঃ চঃ।

ইনি শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতষ্পুত্রী নারায়ণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে সময়ে শ্রীবাসের গৃহে নিত্যানন্দ ব্যাস পূজা করিয়াছিলেন, সে সময়ে নারায়ণীর বয়স ৪ বৎসর। চৈতন্য এই বালিকাটীকে বড় ভাল বাসিতেন। ব্যাসের উদ্দেশে নিবেদিত প্রসাদ আপনি খাইয়া ভুক্তাবশেষ নারায়ণীকে দিয়াছিলেন। অতএব বৈষ্ণবেরা বিশ্বাস করেন যে, চৈতন্যদেবের শক্তি সঞ্চার হেতু বৃন্দাবন দাস ব্যাসের অবতার হইয়া উত্তরকালে নারায়ণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন।

"নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিল শ্রীদাস বৃন্দাবন।"
চৈঃ চঃ।

বৃন্দাবন দাস প্রণীত বলিয়া চৈতন্যজীবন সম্বন্ধে একণে যে গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম চৈতন্যভাগবত। অথচ চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে উহার নাম চৈতন্য মঙ্গল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এরূপ নাম পরিবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে এই কিম্বদন্তী আছে যে, পরবর্ত্তী সময়ে লোচন দাস নামক জনৈক বৈদ্যবংশীয় বৈষ্ণব চৈতন্য জীবন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক গ্রন্থ রচনা করিয়া চৈতন্য মঙ্গল নামে তাহার নামকরণ করেন। তৎকালের প্রথানুসারে গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে গ্রন্থকারকে আপন গুরুর অনুমতি লইতে হইত। লোচনের ইষ্ট দেবের নিকট মঞ্জুরার্থে ঐ পুস্তক আনীত হইলে তিনি দেখিলেন যে, বৃন্দাবনের গ্রন্থের নামে এই গ্রন্থ অভিহিত হইয়াছে। তজ্জন্য শিষ্যের উপর বিরক্ত হইয়া তিনি বলিলেন যে "বৃন্দাবন দাস সম্বন্ধে তোমার যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা যতক্ষণ নিরাকৃত না হয়, ততক্ষণ এ গ্রন্থ প্রকাশ করিবার অনুমতি দেওয়া দূরে থাকুক, তোমার মুখ দর্শন করিব না।" বৃন্দাবন দাস তখনও জীবিত ছিলেন। লোচন দাস অগত্যা বৃন্দাবনের নিকট যাইয়া আদ্যোপান্ত বিবৃত করাতে বৃন্দাবন দাস প্রসন্ন চিত্তে তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন ও আপন গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "চৈতন্য ভাগবত" রাখিলেন।

চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে দ্বিতীয় গ্রন্থ চৈতন্য চরিতামৃত। যদিও ইহা চৈতন্যভাগবতের পরে বিরচিত হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক রূপে চৈতন্যের ধর্ম্ম মত সমর্থন, তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য ও ঘটনাবলীর বৈচিত্রতা প্রদর্শন ও রচনার গুরুত্বিতা ও পাণ্ডিত্য প্রভৃতি ধরিলে ইহা সর্ব্ব প্রধান গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। বাস্তবিকও বৈষ্ণব সমাজে ইহা তদ্রূপেই গৃহীত হইয়া আসিতেছে। ইহা বাঙ্গলাসাহিত্যসংসারের একটী অক্ষয়

জ্ঞান ভাণ্ডার ও প্রেম ভক্তির অমৃত প্রস্র-বণ। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, যে সকল গ্রন্থকার পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, চৈতন্য-চরিতামৃত-রচয়িতা তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির এমনি দুর্দ্দশা যে, তাহারা আপনাদের জ্ঞান ভাণ্ডারে কি আছে তদনুসন্ধান বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।

বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া উপবিভাগের অধীন ভাগীরথী নদীর পশ্চিম পারে ঝামটপুর নামে এক খানি পল্লী গ্রাম অদ্যাপিও বৰ্ত্তমান আছে। এই গ্রামেই চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম স্থান।

"নৈহাটী নিকটে ঝামটপুর গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম।" চৈঃ চঃ।

কথিত আছে যে, তিনি অল্প বয়সেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও স্বপ্নে নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করত বৃন্দাবনে যাইয়া সমস্ত জীবন যাপন করেন। সে সময়ে বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব-গণ প্রত্যহ অপরাহ্নে বৃন্দাবনবিরচিত চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ শ্রবণ করিতেন; কিন্তু ঐ গ্রন্থে চৈতন্যের শেষ জীবনের বিষয় বিস্তৃতরূপে লিখিত না থাকায় তাঁহাদের আশা পরিতৃপ্ত হইত না। তজ্জন্য মদন মোহন মন্দিরের অধ্যক্ষ হরিদাস পণ্ডিত প্রভৃতি কৃষ্ণদাসকে ঐ সম্বন্ধে এক গ্রন্থ রচনা করিতে আদেশ করিলেন। কৃষ্ণদাস যদিও তখন বৃদ্ধ, কিন্তু নবোৎসাহে উৎসা-হিত হইয়া ঐ গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন; এবং উদ্যমের ফলস্বরূপ এই গ্রন্থ ব্রজবাসীদিগকে উপহার দিলেন।

"বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল;
তাহাতে চৈতন্য লীলা বর্ণিল সকল।
সূত্রকরি সব লীলা করিল গ্রন্থন;
পাছে বিস্তারিয়া তাহা কৈলবিবরণ।
চৈতন্য চন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার;
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার।
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন;
চৈতন্যের শেষ লীলা না কৈল বর্ণন।"
চৈঃ চঃ ১০০৮—১০১২।

"আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ;
শেষ লীলা শুনিতে সবার হইল মন।
মোরে আজ্ঞা দিল সবে করুণা করিয়া;
তাঁ সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া।"
চৈঃ চঃ ১০৩৫—১০৩৬।

১৫৩৭ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে রবিবার কৃষ্ণ-পঞ্চমী তিথিতে বৃন্দাবন নগরীতে চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়। তৎ সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন।

"শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে
সূর্য্যাহেঽসিতপঞ্চম্যাংগ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং
গতঃ।"

১৪৫৫ শকে চৈতন্যদেবের তিরোভাব হয়। সুতরাং তাঁহার স্বর্গারোহণের প্রায় ৮২ বৎসর পরে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়া-ছিল। এইগ্রন্থ প্রণয়ন সমাপ্ত হইলে জীব গোস্বামীর অনুমতি লইয়া প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে কৃষ্ণদাস তাঁহাকে ইহা পাঠ করিতে দিয়াছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য ও চৈতন্য উপদেশ সকল বঙ্গভাষায় বিবৃত হইয়াছে; তাহা অবলীলা ক্রমে সাধারণের আয়ত্তাধীন হইল, অথচ আপ-নাদের রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ সকল প্রকাশিত

হইবে না, এই আশঙ্কায়, কৃষ্ণদাসের উপর রাগান্বিত হইয়া ক্ষুদ্র চেতা জীবগোস্বামী তাঁহার গ্রন্থ লুকাইয়া এক কুঠরীর মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলেন ও কবিরাজকে কটূক্তি করিলেন। বৃদ্ধ কবিরাজ ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া মথুরায় গমন করিয়া সর্ব্বদা এই দুঃখ করিতে লাগিলেন যে, সাধারণে পড়িবে বলিয়া তিনি পুস্তক রচনা করিলেন, তাহা প্রকাশিত হইল না ও গৌরাঙ্গের শেষ লীলাও অপ্রচারিত রহিয়া গেল।

"আমি যে করিনু গ্রন্থ সবার কারণে,
বিদ্যা না হইলে ধর্ম্ম বুঝিবে দর্শনে।
প্রভুর যে শেষ লীলা কেহ না জানিবে,
প্রেমভক্তি আচরণ কেহ না শিখিবে,
হেন গ্রন্থ দৈবে গেল কেহ না পাইবে;
দয়াল চৈতন্য লীলা কেহ না জানিবে।"

বিবর্ত্ত বিলাস।

এই সময়ে মুকুন্দ দত্ত নামে কবিরাজের জনৈক শিষ্য তাঁহাকে জানাইলেন যে, চৈতন্য চরিতামৃত যখন রচিত হইয়াছিল, তাহার এক এক সর্গ সমাপ্ত হইলে তিনি (মুকুন্দ) এক একপ্রস্থ নকল করিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ সমস্ত গ্রন্থের নকল তাঁহার নিকট রহিয়াছে।

"মুকুন্দ কহিল প্রভু করি নিবেদন,
যে কালে আপনি করেন গ্রন্থের লিখন।
পরিচ্ছেদ সাঙ্গ হৈলে লৈয়াছি মাগিয়া—
পড়িয়া লিখিয়া প্রভু দিতাম আনিয়া।"

বিবর্ত্ত বিলাস।

ইহা শ্রবণে বৃদ্ধ কবিরাজের আর আনন্দের সীমা থাকিল না। তিনি ঐ নকলটী আদ্যোপান্ত পড়িয়া ও সংশোধন করিয়া মুকুন্দকে গোপনে রাখিতে বলিলেন, যেন জীব তাহা জানিতে না পারেন।

"মুকুন্দে আনন্দ হইয়া কহিল বচনে,
প্রকাশ না করিও এবে রাখ সাবধানে।"

বিবর্ত্ত বিলাস।

পরে মুকুন্দ দ্বারা কবিরাজ ঐ নকল গ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। তদবধি তাহা ক্রমে ক্রমে এদেশে প্রচার হইয়া পড়ে।

"গ্রন্থ লৈয়া যাও বাপ শ্রীগৌর মণ্ডল,
লিখিয়া লয়েন যেন বৈষ্ণব সকল।
যারে তারে দিবা বাপ কহেন বচন।"

বিবর্ত্ত বিলাস।

কৃষ্ণদাসের স্বহস্ত লিখিত আসল গ্রন্থ অদ্যাবধি বৃন্দাবনে রাধা দামোদরের মন্দিরে আবদ্ধ রহিয়াছে; তাহা এদেশে কখন আইসে নাই।

ধর্ম্ম সমাজে চিরকালেই ব্যক্তিগত প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য কত না বিবাদ কলহ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনাটী এরূপ ঘটনাপুঞ্জের একটী অংশ মাত্র। একদিকে জীবগোস্বামীর ক্ষুদ্রাশয়তা ও ঈর্ষা, অপর দিকে কৃষ্ণদাসের উদার ভাব তুলনা করিতে গেলে মনে হয় যে, এইরূপে ধর্ম্ম জগতে কতই না অনিষ্টপাত হইয়া গিয়াছে। যদি ভাগ্য ক্রমে মুকুন্দ দত্তের নিকট একটী নকল না থাকিত, তাহা হইলে ধর্ম্ম জগতের একটী প্রধান রত্ন কীটদষ্ট পুঁথির আকারে বিগ্রহ মন্দিরে লুক্কায়িত থাকিত ও অবশেষে বিনষ্ট হইয়া যাইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চৈতন্য চরিতামৃতের পর লোচন দাস চৈতন্য মঙ্গল নামে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থে বিশেষ নূতনত্ব কিছুই নাই। তাহা চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃতের ছায়ামাত্র। তবে তাঁহার প্রণীত পয়ার ও

ধুয়া গীতি কাব্য আকারে লিখিত হইয়াছে। যেরূপ কীর্ত্তিবাস ওঝার রামায়ণ, ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র গীত হইয়া থাকে, তদ্রূপ লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গলের গান বৈষ্ণবপ্রধান রাঢ় দেশের অনেক স্থানেই গীত হইতে দেখা যায়। বোধ হয় গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এইরূপে চৈতন্যের জীবন লীলা সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়।

চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম বিষয় আলোচনার জন্ম যে প্রমাণ প্রয়োজন, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থ নিচয়ে পাওয়া যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন ভক্তমালে চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক ও অন্যান্য অনেক গ্রন্থ আছে, যাহাতে এসম্বন্ধে অনেক আলোক পাইতে পারা যায়। কিন্তু তৎস্বাবতই পরবর্ত্তী কালের ও ক্রমেই জনশ্রুতি মূলে লিখিত হওয়ায় অধিক নির্ভরণীয় হইতে পারে না।

পরবর্ত্তী অধ্যায় চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গসমাজের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অবস্থা কিরূপ ছিল ও তাহা কোন্ কোন্ শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল, তাহা আমরা বৈষ্ণবীয় গ্রন্থ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে যত্ন করিব। শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

---

# প্রবাসে।

(পদ্য)

"This glassy stream, that spreading pine,
Those alders quivering to the breeze,
Might sothe a soul less hurt than mine,
And please, if anything could please."
*Cowper.*

(১)

শান্তিহীন, সুখহীন,—পোহাল রজনী।
প্রবাস-যাতনা বুকে,
অনিদ্রার ক্লান্তি চোখে,
তবুও শৈলের শিরে (১) ছুটিনু অমনি।
জানিনা কি হবে তায়,
সুখ কি অসুখ হায়;
আগ্রহে তবুও শয্যা ত্যজিনু তখনি।

(২)

ঊষা, নব প্রেম ভরে,
প্রেমময় স্নিগ্ধাধরে
চুমিরা শৈলের শিরে, দোলে তার কোলে;
সে চুম্বনে আলিঙ্গনে,
বুক চিরে প্রেমধনে
প্রপাত ধারায়(২) শৈল দিতেছেরে ঢেলে!
কে নিন্দে পাষাণ, বার, প্রেমে হিয়াগলে?
সে প্রেম-প্রবাহে তার,
তরল—তরলাকার
ঊষার উজল প্রেম, 'ফলিত চকিত;
আহা কি মাধুরী মরি মিলনে উদিত!

(৩)

হেরি এ মোহন ছবি,
কি গীত গাইবে কবি?
আছে কি উচ্ছ্বাস, প্রাণে সরস এমন?
উচ্ছ্বাসে গাহিছে পাখী,
উচ্ছ্বাসে কাঁপিছে শাখী,
উচ্ছ্বাসে স্ফুরিত নেত্র তরুণ তপন!

(১) উড়িষ্যার প্রধান পাটাগিরি।

(২) প্রধান পাহাড়ের জলপ্রপাত।

( ৪ )

বিচ্ছেদের বিষময়
আশা শূন্য এ হৃদয়,
হায়রে মিলন-পুরে কেমনে রাখিব ?
ঢালি বিষাদের শ্বাস,
আনন্দের এ উচ্ছ্বাস
—হৃদয়হীনের মত—কেন নিবাইব ?
এ মোর হৃদয় সম
ঐ হোথা অন্ধতম
রবিকর স্পর্শশূন্য গভীর গহ্বর ;
উহারি নিভৃত কোণে
যাতনার সুর তুলে,
গাহিব উন্মাদ গীত, অজ্ঞাতে সবার !
তুমি না বুঝিবে সখি, সঙ্গীত আমার !
পার কি বুঝিতে হায়,
অনন্ত আকাশ গায়
কি দুঃখে জলদ নাদে,—একাকী, গম্ভীর ?
বজ্রনাদ ধরে যার
বুকের বিষাদ ভার,
নিশ্বাসে বিজলী কত হানে শত তীর ?
তুমি কি বুঝিবে তবে দুঃখ প্রবাসীর ?

( ৫ )

হেমন্তে পদ্মিনী মত,
নিত্য মধু পরিপ্লুত
প্রেমভরা প্রাণ, গৃহে পড়িছে ঝরিয়া,
দারুণ বিষাদ-হিম বুকেতে লাগিয়া।
জ্যোৎস্নাময় কত হাসি
—কৃষ্ণায় যেন রে শশী—
আঁধারের কালামুখে যেতেছে ডুবিয়া
মরিতেছে কত আশা কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
কি তাপ পরাণে তার
কার সাধ্য বুঝিবার ?
কি প্রলেপ, ওহে বৈদ্য করিছ বিধান ?
রাধার ব্যাধির রাখে কানাই সন্ধান !

হেসোনা হেসোনা সুখি,
আমার মতন দুখী
না হলে বুঝিবে নাকো, যাতনা আমার ;
হাস তুমি, আমি ঢালি ধারা বরষার !
স্নেহ ভরা আলিঙ্গন,
প্রাণভরা সম্বোধন,
জননি গো, কত দিনে মিলিবে আবার,
ভাবিয়া কাঁদিছে আজি তনয় তোমার !
চৌদিকে ভীষণারণ্য,
—প্রাণহীন্—স্নেহশূন্য—
কোথা হেথা ভ্রাতৃস্নেহ বন্ধুর মমতা ?
কে কহে আমার দুখে শান্ত্বনার কথা ?

( ৬ )

পরিজন পার্শ্বে যার
কি ক্লেশ গাহিতে তার (৩)
"বড়ই সুন্দর আহা শোভা প্রকৃতির।"
একবার শূন্য প্রাণে
চাহ রে প্রকৃতি পানে,
বুঝিবে মাহাত্ম্য কত ওই মূরতির !
তাই বলি বুঝিবে না,
যে যাতনা যে বেদনা
দহিছে সতত হায় প্রাণ প্রবাসীর !
সুখী না বুঝিবে কভু বেদনা দুখীর !

( ৭ )

মানব বদন সম
অতুলন—অনুপম,
সুন্দর—সুস্নিগ্ধ আর কি আছে ধরায় ?
প্রকৃতি সুন্দর হয়, তাহারি ছায়ায় !
ছাড়ি প্রেম কিশোরীর,
(প্রিয় গীতি বাঁশরীর)
যশোদার ননি ছানা, ছিদাম বলাই,
বৃন্দাবন কুঞ্জতলে
যমুনার নীল জলে,

(৩) কবি Wordsworth

কি আছে, আদর যার করিবে বানাই ?
প্রিয় স্মৃতি বিজড়িত
কাঁটা বনে, মধু কত !
তাই ভালবাসি, ক্ষুদ্র গৃহের প্রাঙ্গন ;
শোভাহীন হেরি এই বন উপবন।

( ৮ )

চাহি না দেখিতে আর,
স্বচ্ছ নির্ঝরের ধার
শিলা হতে শিলান্তরে পড়িতে ছুটিয়া ;
চাহিনা গগন-ভালে
হেরিতে সাঁজের কালে
তারকা শশীর শোভা উঠিতে ফুটিয়া ;
দে মোর প্রেমের শশী,
দে মোর প্রেমের হাসি,
দেরে মোর লীলাময় প্রবাহ প্রেমের,
চাহি না ও শোভা রাশি শূন্য জগতের !

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

---

# ঈশ্বরজ্ঞান প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষ ? *

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ?"

আমাদের প্রকাশিত 'পৌত্তলিক কে' প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছিলাম, "সাধারণ ভাবে ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান মানুষ মাত্রেরই আছে।" তত্ত্বকৌমুদী সেই প্রবন্ধের সমালোচনা করিতে গিয়া বলিতেছেন "দ্বিজদাস বাবু নিজেই বলিয়াছেন এবং ইহাই সত্য যে 'বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম সম্প্রদায় সকলের' সাধারণতঃ ঈশ্বর সম্বন্ধে 'পরোক্ষ' জ্ঞান কিছু কিছু আছেই।" তত্ত্বকৌমুদী আমাদের 'জ্ঞান' শব্দের স্থলে 'পরোক্ষ জ্ঞান' ও 'মানুষ মাত্রেরই' স্থলে "বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্ম সম্প্রদায়" বসাইয়া প্রকৃত পক্ষে আমাদের কথার সমালোচনা না করিয়া নিজের কথারই সমালোচনা করিয়াছেন। বোধ হয় লেখক আমাদের কথা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ধার্ম্মিকদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেছেন ;—(১) যাহাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিয়াছে (২) যাহাদের ঈশ্বর জ্ঞান পরোক্ষ। প্রথম শ্রেণী সম্বন্ধে বলিতেছেন, "যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ ভাবে জানিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। কারণ তিনি আবার অন্য কল্পিত উপায় গ্রহণ করিবেন কেন?" এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজই বোধ হয়। (১) সাধু অন্যের দৃষ্টান্তের জন্য, অথবা "চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহং" অনেক কার্য্য করিতে পারেন। তিনি নিজে যদি মূর্ত্ত চিহ্ন ব্যবহারে সাধনা সহজ বোধ করিয়া থাকেন, তবে অন্যের জন্যও সে পথ সহজ হইতে পারে, এই আশায় দৃষ্টান্তের জন্য তিনি মূর্ত্ত চিহ্ন ব্যবহার করিতে পারেন। একজন উন্নত ব্রাহ্ম হয়ত মন্দিরে বসিয়া উপাসনাতে এবং নির্জন উপাসনাতে সমান সরস ভাব লাভ করেন, তথাপি অন্যের দৃষ্টান্তের জন্য হইলেও তিনি নিয়মিত ভাবে মন্দিরে যাইতে পারেন। (২) অথবা বাহ্য জগতে

---

* এই প্রবন্ধটী তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাতে প্রকাশ না হওয়ায় নব্যভারতে দেওয়া গেল।

কিম্বা পুত্তলে ঈশ্বর পূজাকে উপায় বলিবার প্রয়োজন কি? ব্রহ্মদর্শন যাহার লাভ হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে চক্ষু মুদিয়া আত্মাতে সে দর্শন লাভ করা যাহা, চক্ষু খুলিয়া বহির্জগতে সে দর্শন লাভ করাও তাহাই; এবং আকাশ নক্ষত্রাদিতে ব্রহ্মদর্শন যদি তাঁহার পরিহারের বিষয় না হয়, পুত্তলাদিতেও সে দর্শন পরিহার করিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। এ সম্বন্ধে পরে আরও বলা যাইবে। (৩) ব্রহ্মদর্শনে অন্তর বাহির ভেদ থাকে না। "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কম্পশ্যেৎ"। দুই জ্ঞান যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ অনন্তের উপলব্ধি কোথায়? ব্রহ্ম দর্শনে নিরাকার সাকার, আমি তুমি, ঈশ্বর জীব ভেদ থাকিতে পারে না। তাহা হইলে নিরাকার সাকারের সীমা, তুমি আমার সীমা, জীব ঈশ্বরের সীমা হইয়া দাঁড়ায়। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই ব্রহ্ম দর্শনের কথা।

কিন্তু তত্ত্বকৌমুদী মূলেই ভুল করিয়াছেন, তিনি ধার্ম্মিক দিগকে যে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেছেন সেই বিভাগই অসিদ্ধ। তাঁহার পরোক্ষ ঈশ্বর জ্ঞান একটী আকাশ কুসুম। ঈশ্বর জ্ঞান মানব আত্মার নিত্য প্রত্যক্ষ—অথবা সম্বিৎ-সিদ্ধ—, তবে লোকভেদে প্রত্যক্ষের পরিমাণে তারতম্য আছে। কাহারও ঈশ্বরপ্রত্যক্ষ দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল, কাহারও বা অন্ধকার গৃহের রজ্জুর ন্যায় অস্ফুট। মানব আত্মা সংসারের কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করে না, কিছুতেই তাহার অভাব যায় না। যাহার সংসারের সকলই আছে, তাহারও হৃদয়-গহ্বর হইতে নিরন্তর ধ্বনি উঠিতেছে "ইহার কিছুই আমার নয়," তাঁহার প্রাণ ধনজনের মধ্যে বসিয়া ভয়ে নিরন্তর কাঁপিতেছে। তাহার প্রাণ যে অভয় নিয়ত প্রার্থনা করিতেছে, সংসারের বিদ্যা ঐশ্বর্য্য বা পরিজন কিছুই তাহা দিতে পারিতেছে না। প্রাণের প্রাণে থাকিয়া কে যেন অস্ফুট স্বরে নিরন্তর ডাকিতেছে, কোথায় গেলে যেন সকল অভাব পূর্ণ হইবে। ভিতরে বসিয়া কে যেন অনবরত বলিতেছে, "যদ্বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি," কিন্তু জীব বহির্ম্মুখ, নিজকে দেখিয়াও সে দেখে না, সেই অস্ফুট নীরব ধ্বনি সে শুনিয়াও শুনে না; নিজের ভিতরে প্রবেশ করিয়াও করে না। 'আমার' 'আমার' করিয়া জীব ব্যস্ত, কিন্তু আমি কি, মোহে পড়িয়া সে একবার ভাবে না। যাহা পরিবর্ত্তনশীল, যাহা অসৎ, তাহারই লীলায় সে নিয়ত মুগ্ধ; যাহা স্থির, যাহা নিশ্চল, যাহাকে আশ্রয় করিয়া পরিবর্ত্তনশীলের ক্রীড়া চলিতেছে, যাহার সত্তা প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া অসৎ ও সৎ রূপে অবস্থান করিতেছে, মূঢ় জীব সেইরূপ-রসের ধাঁধায় পড়িয়া পরম প্রত্যক্ষকেও প্রত্যক্ষ বলিয়া বোধ করিতেছে না, কাহার রূপ, কাহার রস, একবারও ভাবে না। মোহের আবরণে সেই হৃদয়ের গভীর বাণী অস্ফুটই থাকিতেছে, সেই প্রাণের ছবি অন্ধকারাচ্ছন্নই থাকিতেছে। কিন্তু বিপদের সময়ে যখন এই দৃশ্য অসৎ আর মানব মনকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না, যখন জীব বহিঃপ্রবৃত্তির অসারতা দেখিয়া অন্তর্ম্মুখ হয়, যখন চক্ষু কর্ণ আপনার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখনই সেই 'still small voice', সেই অন্ধকার গৃহের রজ্জু, জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেরই নিকটে প্রকাশিত হয়।

আশ্রয় করা যায়, সংসারে এমন কিছুই নাই, অথচ জীব আশ্রয় আশ্রয় করিয়া দাবদগ্ধের ন্যায় ইতস্তত ফিরিতেছে। মানব মাত্রেরই এই কথা। সেই পরম আশ্রয় হৃদয়ে প্রত্যক্ষ হইতেছে বলিয়াই, যে ভাব ত্রিসংসারে কোথাও নাই, তাহা জীব ধারণা করিতে পারিতেছে, তাহার জন্য ব্যাকুল হইতেছে। শান্তি সংসারের কিছুতেই নাই, তথাপি জীব শান্তি শান্তি করিয়া পাগল হইতেছে। পরম শান্তি-স্বরূপ হৃদয়ে প্রত্যক্ষ হইতেছে বলিয়াই যাহা কোথাও নাই তাহাও জীব ধারণা করিতে পারে, তাহার জন্য ব্যাকুল হইতে পারে। অনন্ত হৃদয়ে প্রত্যক্ষ হইতেছে বলিয়াই সংসারের অনন্তবৎ কিছুতেই জীব মজিয়াও চিরদিনের জন্য মজিতেছে না।

ঈশ্বর আছেন, মানুষ মাত্রেরই নিত্য প্রত্যক্ষ। অতি অশিক্ষিত অজ্ঞানী লোকও বিপদকালে আত্মদৃষ্টি করিলে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ বলিয়া বোধ করে, সাক্ষাৎ বোধ করে বলিয়াই উদ্ধার প্রার্থনা করে। নতুবা অনুমান বা উপদেশের অবাস্তবিক ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া কদাপি মন তৃপ্তি মানিত না। বিপদ যেমন প্রত্যক্ষ, প্রতিকারের উপায়ও যদি তেমনই প্রত্যক্ষ না হয়, কে কায়মনপ্রাণে তাহাতে আস্থা প্রদান করিতে পারে? এই আমি প্রাণে মরিতেছি, কাহার নিকটে উদ্ধার প্রার্থনা করিব? যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান জনিত হয় (আপ্ত বচন অথবা 'উপদেষ্টার উপদেশ' ও অনুমানেরই অন্তর্গত) সেই "বোধ হয়ের" ঈশ্বরকে কে তখন ডাকিতে পারে? "হে ঈশ্বর, বোধ হয় তুমি আছ, যদি থাক আমার আত্মাকে উদ্ধার কর, যদি আমার আত্মা থাকে" এ কথা বলিয়া কে নিশ্চিন্ত হইতে পারে? মোট কথা এই, যে ই যখন হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করে, সে ই তখন সেই প্রার্থনার ফল-দাতাকেও হৃদয়ে সাক্ষাৎ অনুভব করে। এক সময়ে না এক সময়ে জীবনে জ্ঞানী অজ্ঞানী সাধু অসাধু সকলকেই প্রার্থনা করিতে হয় এবং সে সঙ্গে ঈশ্বরকেও প্রত্যক্ষ বলিয়া অনুভব করিতে হয়।

কিন্তু কোন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করিলেও তাহার গুণ সম্বন্ধে কিছু কিছু অজ্ঞানতা থাকিতে পারে। যে তোমাকে দেখিয়াছে, সেই যে তোমার সব গুণ জানিয়াছে, এমন নাও হইতে পারে। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে, অথচ তাহার গুণের জ্ঞান অপূর্ণ থাকিতে পারে। যদি কাহারও ঈশ্বরের গুণ বিষয়ে অজ্ঞানতা থাকে, তাহা বলিয়া মনে করা যায় না যে, সে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে না। ঈশ্বর গুণ নহেন, তিনি গুণী, তিনি ব্যক্তি, তিনি পুরুষ। যদি ঈশ্বরের গুণ সম্বন্ধে কোন পৌত্তলিকের কিছু অজ্ঞানতা থাকে, অথচ সে সরল ভাবে ভক্তির সহিত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, গুণ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই বলিয়া মনে করা যায় না যে, সে প্রার্থনা ঈশ্বরের নিকট করা হয় নাই, সে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে নাই।

ফলত অনুমান বা আপ্ত বচন যদি মানুষের ঈশ্বর জ্ঞানের ভিত্তি হইত, তবে বর্ণ এ সংসারে থাকিত না। কি করিয়া অনুমান করিব? যদি ঈশ্বরের মত আরও দুচারি জন থাকিত, যদি সৃষ্টিরমত উপাদানের আরম্ভ হয় এরূপ কার্য্য আরও দুচারিটা আমাদের সর্ব্বদা নয়ন গোচর হইত, অনন্ত যদি পাঁচ সাতটী

হইত, তবে না হয় এক জন ঈশ্বর দেখিয়া, একটা সৃষ্টি ক্রিয়া দেখিয়া, একটা অনন্ত দেখিয়া, অপর জন ঈশ্বরের, অপর সৃষ্টি ক্রিয়ার, অপর অনন্তের বিষয় অনুমান করা যাইত। অনুমানের ঈশ্বর, ঈশ্বর নহেন, তাহার জ্ঞানও ঈশ্বর জ্ঞান নয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান পরিত্যাগ করিলে অনুমানের দ্বারা এই মাত্রই হইতে পারে যে, একটা মানুষের মত লোক কল্পনা করিয়া তাহার মধ্যে কিছু অধিক পরিমাণে মানুষের গুণের মত কতকগুলি গুণ আরোপ করিয়া তাহাকে ঈশ্বর নামে অভিহিত করা যায়। এই ঈশ্বর এক বিরাট্ ‘পুত্তল’ এবং তত্ত্বকৌমুদী যেরূপ বলিতেছেন, যদি বর্ত্তমান ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ঈশ্বর জ্ঞান “পরোক্ষ জ্ঞান” হয়, প্রত্যক্ষ ঈশ্বর জ্ঞান না হয়, তবে সে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় পৌত্তলিক, তত্ত্বকৌমুদী যদি তাহারই একজন হন, যাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না, তবে তিনিও পৌত্তলিক; তাঁহার ঈশ্বর পূজাও মানস পৌত্তলিকতা, অথবা Anthropomorphism। এরূপ লোকও অনাস্তিকদিগেরই একজন। “সে প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাইবার জন্য ব্যাকুল” বলিলেও কিছু আসে যায় না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান কাহার সম্বন্ধে? যদি প্রকৃত ঈশ্বর তাহার অধ্যাত্ম প্রত্যক্ষ একেবারেই না হয়, তবে সে যাহাকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবিতেছে, যাহার সম্বন্ধে সে প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাইবার জন্য ব্যাকুল সেও সেই বিরাট্ মানস পুত্তল। তাহারই সম্বন্ধে কি সে প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাইবার জন্য ব্যাকুল? যদি বলা যায়, উপদেষ্টা যাহাকে ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, সে তাহাকেই প্রত্যক্ষ জানিবার জন্য ব্যাকুল, তাহাতেও কিছুই হয় না। ‘ঈশ্বর কে’ সে না জানিল, উপদেষ্টা কাহাকে ঈশ্বর বলিতেছে, তাহাও সে জানিল না; উপদেষ্টার ‘ঈশ্বর’ তাহার কাছে বাক্য মাত্র, অর্থ শূন্য শাব্দ পুত্তল। গবয় যে দেখিয়াছে, সে যদি বলে গবয় গরুরই মতন, তুমি গরু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিলে তাহারই সদৃশ একটী জন্তু কল্পনা করিয়া তাহাকেই গবয় মনে করিতে পার। ঈশ্বর সম্বন্ধেও যে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ না করিয়াছে, উপদেষ্টার উপদেশে ঈশ্বরের সদৃশ কোন বস্তু থাকিলে তাহা দেখিয়া ঈশ্বর কল্পনা করিতে পারে। তাহা হইলেও সেই কল্পিত গবয় গবয় নয়, গবয়ের মানস প্রতিমা, সেই কল্পিত ঈশ্বরও প্রকৃত ঈশ্বর নয়, ঈশ্বরের মানস প্রতিমা।

শুধু উপদেষ্টার উপদেশে যে কিরূপ ঈশ্বর জ্ঞান সম্ভব, গ্রাম্য গল্পে তাহার একটী দৃষ্টান্ত আছে। একজন দুধ দেখে নাই, সে জিজ্ঞাসা করিল, দুধ কেমন? আর একজন যে দুধ দেখিয়াছে, সে বলিল, দুধ বকের মত। সে বকও দেখে নাই, বক দেখিয়াছে এমন আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করিল, ভাই বক কেমন? কাস্তের মতন। সে কাস্তে দেখিয়াছে; সে ভাবিল দুধ কাস্তের মতন। মীমাংসা করিল, দুধ বড়ই শক্ত, দাঁতে ভাঙ্গা যায় না। বিসংসারে অন্য কাহারও সহিত যাহার তুলনা হয় না, উপদেষ্টাকে উপমা দ্বারা তাহাই বুঝাইতে হইল। উপদিষ্টের ঈশ্বর জ্ঞান ও দুধেতে কাস্তের জ্ঞান ভিন্ন আর কি হইবে?

যদি সাদৃশ্যে ঈশ্বর জ্ঞান সম্ভবও হইত, যদি আত্মার চৈতন্যের দ্বারা ঈশ্বরের চৈতন্যের উপমা হইত, যদি জড়ের সত্তা দ্বারা ঈশ্বরের সত্তার তুলনা হইত, তবে না হয় উপদেষ্টার উপদেশ শুনিয়া ঈশ্বরের এক

তাহাকে [illegible] কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু আত্মা [illegible], প্রকৃত ঈশ্বর নয়। সেই মানব [illegible] মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতেছ ঈশ্বর বলিয়া মানেন, তাঁহাকে তাহাই [illegible] হয়। তোমার সংজ্ঞা সত্ত্বই পৌত্তলিকতা হইল।

আবার অনুমান উপমা দ্বারা কোন ব্যক্তির অথবা আত্মার জ্ঞান, কেবল তাহার [illegible] সম্বন্ধে। যে তোমাকে দেখিয়াছে, সেই মাত্র তোমাকে জানিয়াছে। যে তোমাকে দেখে নাই, সে তোমাকে জানেও নাই। সে তোমার [illegible] ব্যাখ্যা, কার্য্যের ব্যাখ্যা শুনিয়া [illegible] তাহা বলিয়া সে তোমাকে জানে নাই। শ্রোতার আত্মার উপমা দ্বারা তোমার গুণ, তোমার কার্য্যেরও একজন [illegible] সে কল্পনা করিতে পারে, কিন্তু সেই কল্পিত মাত্র তুমি নও। পরোক্ষবাদীর ঈশ্বর সম্বন্ধেও এই কথা। মানিলাম, পরোক্ষবাদী আপনার আত্মার তুলনায় ঈশ্বরের [illegible] কল্পনা করিল। তথাপি যেমন তোমার গুণ কর্ম্মের কল্পিত পাত্র তুমি নও, পরোক্ষবাদীর কল্পিত ঈশ্বরও ঈশ্বর নয়। সেই কল্পিত তুমি যেমন শ্রোতার মনের [illegible] অথবা অবস্থামাত্র, পরোক্ষবাদীর কল্পিত ঈশ্বরও তাহার মনের কার্য্য অথবা অবস্থা মাত্র। পরোক্ষবাদী নিজেই এক ঈশ্বর সৃষ্টি করে, সে তাহার ঈশ্বরেরও ঈশ্বর। পাঠক যদি তাহার নিজের ঈশ্বর সৃষ্ট হইয়া থাকে, হে পরোক্ষবাদী তুমিও তাহাই করিতেছ, শ্রোতা যদি সেই কল্পিত "তুমির" সম্মান করে, তাহাতে তিনি সেই "তুমির-ও তুমি" আপনারই সম্মান করিলেন, প্রকৃত তুমি তাহা পাইলে না। পরোক্ষবাদীর [illegible] অবশ্যই [illegible] পূজা করা। সে [illegible] ঈশ্বরের ঈশ্বর, আপনারই আরাধনা হইল। সে পৌত্তলিক হইতেও ভয়ানক। মোট কথা এই যে, ঈশ্বর জ্ঞান নিত্য প্রত্যক্ষ, না হয় মিথ্যা প্রত্যক্ষ নয়। যদি নিত্য প্রত্যক্ষ হয়, তবে কে প্রত্যক্ষ ঈশ্বর পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতে পারে? কে পৌত্তলিক হইতে পারে? যদি কাহারও নিত্য প্রত্যক্ষ না হইয়া পরোক্ষ হয়, তবে যাহাদের ঈশ্বর জ্ঞান পরোক্ষ, তাহারা সকলেই পৌত্তলিক। যে ধর্ম্ম তাহাদিগের প্রচার করে, সে ধর্ম্মও পৌত্তলিকতা, "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।"

আত্মা যদি প্রত্যক্ষ হয়, যিনি আত্মার আত্মা তিনি প্রত্যক্ষ হইতেও প্রত্যক্ষ। যাহাদের মন বহির্বিষয়ে ঘুরিতেছে, যে ঘরের দিকে চক্ষু দেয় না, সেই আত্মার আত্মাকে দেখিয়াও দেখে না, অনুভব করিয়াও করে না। সেই "দশমের গল্প," অনাত্মজ্ঞ অপ্রত্যক্ষবাদী লোকদিগের পক্ষেই সত্য। দশ জন লোক একত্র সাঁতার দিয়া নদী পার হইল, নির্ব্বিঘ্নে সকলে আসিয়াছে কিনা জানিবার জন্য প্রত্যেকে আপনাদের সংখ্যা গণিতে লাগিল। প্রত্যেকেই নিজকে পরিত্যাগ করিয়া গণনা করিতেছে, গণনাতে নয় জন মাত্র পাওয়া যায়। "হায় কি বিপদ, আমাদের এক জন মারা গিয়াছে" এই বলিয়া সকলে কাঁদিতে লাগিল। ক্রন্দনের শব্দে চারিদিক হইতে লোক আসিয়া জুটিল, একজন পথিক তাহাদের ক্রন্দনে [illegible] হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই তোমরা কেন রোদন করিতেছ?" তাহারা বলিল, "আমরা দশ জন একত্রে পার হইয়াছিলাম,

প্রকার বাদ্য প্রস্তুত করিয়া দর্শকগণকে আহ্বান করিতেছে। যাহার ইচ্ছা হইতেছে, তিনি উচিত মূল্য দিয়া আহার করিতেছেন। উপরের একটী ক্ষুদ্র স্থানে কতকগুলি ভারতবর্ষীয় বস্ত্র রক্ষিত হইয়াছে। অনেক দর্শক ঢাক, ঢোল, খোল বাদ্যযন্ত্র দেখিয়া ভারতবর্ষীয়গণ সুসভ্য সঙ্গীত বিদ্যা জানে না মনে করিতেছেন, কিন্তু তাহারা সংস্কৃত শাস্ত্রানুসারী বীণাবাদন শুনিলে হিন্দুগণ সঙ্গীত শাস্ত্রে যে কি পর্য্যন্ত সুদক্ষ, তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই সকল ঘরের সংলগ্ন একটী প্রকাণ্ড প্রাসাদে আসিলাম। তাহার নাম "আলবার্টহল" ইহার মধ্যস্থল অতি প্রকাণ্ড, ছোট খাট রোমের কলোসিয়ম বলিলে হয়। ইহার উপরে চিত্রশালা, তথায় অনেক ভাল ভাল ছবি আছে, সেখানে দুই সহস্র লোকের বসিবার আসন রহিয়াছে। এখানে সঙ্গীত হইয়া থাকে। অর্গেনের বাদ্যযন্ত্র অতি প্রকাণ্ড। এ স্থানের সঙ্গীত শালায় এক সহস্র গায়ক ও বাদ্যকর উপবেশন করিতে পারে।

মাদাম টুসোঁর মোমের প্রতিমূর্ত্তি প্রদর্শন গৃহ লণ্ডনের একটী বিখ্যাত দৃশ্য। মাদাম টুসোঁ ফরাসীস স্ত্রীলোক। তিনি তাঁহার খুল্লতাতের নিকট মোমের মূর্ত্তি প্রস্তুত করা শিক্ষা করিয়া ষোড়শ লুই নৃপতির ভগ্নী মাদাম এলিজেবেথকে মূর্ত্তি গঠন বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করাইতেন। প্রথম ফরাসীস বিদ্রোহের সময় মাদাম টুসোঁ ফ্রান্স পরিত্যাগ করিয়া লণ্ডনে আসিয়া মোমের প্রতিমূর্ত্তির প্রদর্শন গৃহ খুলিয়া দেন। ইহাতে কয়েক বৎসর মধ্যে তাঁহার অনেক টাকা উপার্জ্জন হয়। এক্ষণে তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি এই ব্যবসা দ্বারা প্রচুর ঐশ্বর্য্য করিয়াছেন।

প্রথম গৃহে নৃপতিগণ, ষষ্ঠ হেনরি, এডওয়ার্ড, রাজ্ঞী এলিজেবেথ, কার্ডিনেল উলসি প্রভৃতি সজীবের ন্যায় রহিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সঙ্কুচিত হইলাম। ইংরাজী আদি কবি জিওফ্রি চসরের পবিত্র মুখ দেখিলে ভক্তির উদয় হয়। দ্বিতীয় ঘরে ভিক্তর ইমানুএল বীর গারিবল্ডি, কড্‌গ্রাহাম, সেক্সপীয়র, আরবি পাশা, মাহদি, আব্রাহেম লিঙ্কন্ প্রভৃতির মূর্ত্তি শোভিত আছে। ইহার মধ্যে ভলটেয়ারের মূর্ত্তি মাদাম টুসোঁ স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এ মূর্ত্তি গুলি সকলই অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। দেখিলে জীবিত মনুষ্য বলিয়া ভ্রম হয়। এক স্থানে মাদাম সেণ্ট আমারেন্থ নামক একটী পরম রূপবতী কামিনী শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার বক্ষ সজীবের ন্যায় ধুক্ ধুক্ করিয়া নড়িতেছে। ইনি প্রথম ফরাসী বিপ্লবের সময় দুরাত্মা রোবস্পিয়রের কোপে পতিত হইয়া গিলোটাইন যন্ত্রের ছুরিকাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। এই সকল প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে ভারতবর্ষীয় বিখ্যাত কয়েক ব্যক্তির মূর্ত্তি রহিয়াছে। মহারাজ গোয়ালিয়র, কাশ্মীরের (মৃত) নৃপতি, ভূপালের বেগম এক স্থানে রহিয়াছেন, তাহার মধ্যে ভারতবর্ষীয়া রাজ্ঞী উপবেশন করিয়া আছেন। আমাদের মূর্ত্তি-স্থানগণ দেখ, ইংলণ্ডের লর্ড রিপনের কেমন সম্মান। একটী ঘরে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সেণ্ট হেলেনার বন্দী হইয়া যে শয্যায় শয়ন করিতেন, তথায় যে বালিশে মাথায় দিয়া মৃত্যু হয়, যে রাজবেশ পরিধান করিয়া তিনি সম্রাট রূপে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজ্ঞী জোসেফাইনের পরিচ্ছদ প্রভৃতি রক্ষিত

ছড়া।

করুণ সজল আঁখি
ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে থাকি
কাতরে মঙ্গল ভিক্ষা মাগিত আমার!
যেন তপস্বিনী বেশে
নরের নরক দেশে
ছিল পুণ্য প্রস্রবণ মূর্ত্তি মমতার!
জননী, ভগিনী, জায়া,
সকলের দয়া মায়া,—
প্রেম তিলোত্তমা ছিল সারদা আমার!
আর কি কহিব হায়,
আজি রাক্ষসের প্রায়,
অনল দিয়েছি সেই আননে তাহার,
কৃতঘ্ন আমার চেয়ে আছে কি হে আর?

৩

তুমি ত অনন্ত উর্দ্ধে ওহে শশধর,
আর কি নিখিল ভূমে,
এমন চিতার ধূমে,
দেখেছ করিতে কারে আচ্ছন্ন অম্বর?
শীতল পুণ্যের ছায়া
প্রাণময়ী প্রিয় জায়া
প্রীতির অপরাজিতা পারিজাত থর,
অনন্ত অমৃত সিন্ধু
প্রেম পূর্ণিমার ইন্দু
দেখেছ ছিঁড়িয়া দিতে চিতার উপর?
আপনার বুক চিরে
না দিয়া ধমনী শিরা
দা দিয়া কলিজা খুলে—কোন্ মূর্খ নর,
আহাহা আমার মত
পিশাচ রাক্ষস এত,
কাঞ্চন কল্প লতা—কুসুমের থর,
দেখেছ ছিঁড়িয়া দিতে চিতার উপর?

৪

"বল হরি হরি!"
কি ঘোর গম্ভীর রব, কাঁদিয়া দিগন্ত সব,
উঠিয়াছে নৈশাকাশ যে সপাড় করি;
জ্বলিছে প্রচণ্ড চিতা—"বল হরি হরি!"
রোগ শোক দুঃখ জরা, ত্যজিয়া এ বসুন্ধরা,
যায় আজ দিব্য ধামে সারদা সুন্দরী,
বুঝিয়াছি শশধর
বরষি অমৃত কর
এসেছ লইতে তারে অভিষেক করি!
কোমল কৌমুদী রথে
হীরা বাঁধা ছায়াপথে
তুলিয়াছ কি সুন্দর সারদা লহরী!
অই ভাসে অই যায়,
অই অনন্তের গায়,
নিখিল জন্মের মত আহা মরি মরি!
আনন্দে অমর কুল
বর্ষিছে তারায় ফুল;
বহিছে স্বর্গীয় বায়ু সুগন্ধ বিতরি,
জননী আনন্দময়ী
বরণ করিয়া অই
লইতেছে পুত্রবধূ সুখে কোলে করি!
কি আনন্দ দেবভূমে
আজি আনন্দের ধূমে
উঠিছে ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব কোলাহল করি,
জ্বলিছে প্রচণ্ড চিতা—"বল হরি হরি!"
রোগ শোক দুঃখ জরা
ত্যজিয়া এ বসুন্ধরা
যায় আজ দিব্যধামে সারদা সুন্দরী।
বল চন্দ্র বল তারা—"বল হরি হরি!"

৫

পশু, পক্ষী, তরু, লতা,
যে তোমরা আছ যথা,
প্রকৃতি অনন্ত কণ্ঠে—"বল হরি হরি!"
অপ্সর, কিন্নর, নর,
যক্ষ, রক্ষ, বিদ্যাধর,
ভূলোক দ্যুলোকবাসী অসুর, অমরী,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব—"বল হরি হরি!"

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

# একটী কথা।

তোমরা অদৃষ্ট মান না। আমি মানি, এ অন্ধকার পৃথিবীতে কি সকল বিষয়ের কারণ নির্দেশ করা যায়? এক দিন এ হৃদয়ের আশার মলিন কাননে নিশি দিন যে কামিনী প্রেম হইয়া ফুটিত, আজ সে ফুলের একটি ও ত আর ফুটিয়া নাই।—চারি দিকই ধূমে আচ্ছন্ন। এখানকার ত সবই এই রূপ। হয় ত সে রাগিনীর হৃদয়ের চাবি যাহার হাতে ছিল, সে বুঝি নাই। অথবা তাহার কোথায় যে কি হইয়াছে, তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব। কি বলিব? কি একটা গোলমাল—কিসের একটা ঘন বিষাদ মেঘ—যেন হৃদয়ের অন্ধকারময়ী নদী দেখিতে বসিয়া কে কাঁদিতেছে। সেই জন্যই বলি যে, কেনর অদৃষ্ট মূল সকল খবর পাওয়া যায় না।

জীবনের প্রতি ঘটনার কারণ কে কবে নির্দেশিয়া পাইয়াছে? সেই অদৃশ্য মহাশক্তির অদৃশ্য করের ঘোর নিক্ষেপের মুখে পড়িয়া কি হইতেছে এবং কে কোথায় যাইতেছি, বলিতে পার কি? বন্ধন মুক্ত হইয়া যাইতেছে, আবার মুক্ত পদার্থ যুক্ত হইতেছে। ইহাই ত এখানকার এই প্রকৃতির নিয়ম। সে নিয়ম অ-দৃষ্ট। সেই অদৃষ্ট বিরাট প্রবৃত্তি তোমার মুখ চাহিবে না। প্রকৃতির বিশাল কারখানায় অবিশ্রাম কার্য্য চলিতেছে। সে কার্য্য কেমন নীরব। প্রকৃতির কার্য্য কি? নির্ম্মাণ ও ধ্বংসীকরণ—জীবন ও মৃত্যু। তাহার মধ্যে তোমার নিজের [illegible] [illegible]—ভুলিও, পড়িও—শুনিও [illegible]। তোমার মনের সাধের কত সাধ—কত আকাঙ্ক্ষা, কত আশা ও কত প্রেম যে চূর্ণ হইয়া যাইবে তাহা কে বলিতে পারে? কে বলিতে পারে, এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে প্রকৃতি কত গৃহে বিচ্ছেদের চির বিষাদ লহরী তুলিয়া দিয়া, আবার কত গৃহে বিবাহের আনন্দ স্রোত ভাসাইয়া সুখের চির পূর্ণিমার রজনী গড়িতেছেন। হায়! তোমার বিজ্ঞান কেবল বাহ্য জগতেরই কথা জানে। কিন্তু আমার মনের কোন্ কথা বা ঘটনার কারণ দিতে পারে? তবে ভাই অদৃষ্টের এত নিন্দা কর কেন? হিন্দুর অদৃষ্ট তত্ত্ব তোমরা ত ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর না। তাই বলি, দিন কতক "ঊনবিংশ শতাব্দী" ও "বিজ্ঞানের প্রখর আলো" প্রভৃতি কতক গুলি বড় বড় জল্পনার কথা ভুলিলে কি ভাল হয় না?

সবই অদৃষ্ট। সেই জন্যই মাধুরী আজ অস্ফুট বিধবা। বালিকা মাধুরী আজ বিধবা। মাধুরীর আশার আকাশের সুখের পূর্ণ চাঁদ আজ কোথায়? আজ এ বাঙ্গালার কয়জন বিধবার দুঃখে অশ্রুপাত করে? আজ আমার বাঙ্গালার প্রতি ঘরে ঘরে এই রূপ এক একটী বিষাদময়ী মাধুরী মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। আজ তাহাদের সেই সুখ শূন্য নবীন জীবন কাননের প্রতি ফুলে জীবনগ্রাসী মৃত্যু কীট বাস করিতেছে। বালিকা বিধবার স্নেহ ভিক্ষা পূর্ণ নীরব পবিত্র কটাক্ষের অর্থ আমাদের দেশের বড়-দর্শী সমাজ সংস্কারকেরা ইচ্ছা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন না। বালিকা বিধবার অশ্রু পূর্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস ও জগতে অতুলনীয়

# একটী কথা।

তোমরা অদৃষ্ট মান না। আমি মানি, এ অন্ধকার পৃথিবীতে কি সকল বিষয়ের কারণ নির্দ্দেশ করা যায়? এক দিন এ হৃদয়ের আশার মলিন কাননে নিশি দিন যে রাগিণী প্রেম হইয়া ফুটিত; আজ সে ফুলের একটী ও ত আর কুড়িয়া নাই।—চারি দিকই ধূমে আচ্ছন্ন। এখানকার ত সবই এই রূপ। হয় ত সে রাগিনীর হৃদয়ের চাবি যাহার হাতে ছিল, সে বুঝি নাই! অথবা তাহার কোথায়-যে কি হইয়াছে, তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব। কি বলিব? কি একটা গোলমাল—কিসের একটা ঘন বিষাদ মেঘ—যেন হৃদয়ের অন্ধকারময়ী নদী সৈকতে বসিয়া কে কাঁদিতেছে। সেই জন্যই বলি যে, কেনর অদৃশ্য মূল সকল সময় পাওয়া যায় না।

জীবনের প্রতি ঘটনার কারন কে কবে মিলাইয়া পাইয়াছে? সেই অদৃশ্য মহাশক্তির অদৃশ্য তরঙ্গের ঘোর বিপ্লবের মুখে পড়িয়া কি হইতেছে এবং কে কোথায় যাইতেছি, বলিতে পার কি? বন্ধন মুক্ত হইয়া যাইতেছে, আবার মুক্ত পদার্থ যুক্ত হইতেছে। ইহাই ত এখানকার এই প্রকৃতির নিয়ম। সে-নিয়ম অ-দৃষ্ট। সেই অদৃষ্ট বিরাট প্রকৃতি তোমার মুখ চাহিবে না। প্রকৃতির বিশাল কারখানায় অবিশ্রাম কার্য্য চলিতেছে। সে-কার্য্য কেমন নীরব। প্রকৃতির কার্য্য কি? নির্ম্মাণ ও ধ্বংসীকরণ—জীবন ও মৃত্যু। তাহার মধ্যে তোমার নিউটন পড়িয়াছে—তুমিও পড়িবে—আমিও পড়িব। তোমার সঙ্গে আবার কত সাধ—কত আকাঙ্ক্ষা, কত আশা ও কত প্রেম যে চূর্ণ হইয়া যাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? কে বলিতে পারে, এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে প্রকৃতি কত গৃহে বিজয়ার চির বিষাদ লহরী তুলিয়া দিয়া, আবার কত গৃহে বিবাহের আনন্দ স্রোত ভাসাইয়া সুখের চির পূর্ণিমার রজনী গড়িতেছেন। হায়! তোমার বিজ্ঞান কেবল বাহ্য জগতেরই কথা জানে। কিন্তু আমার মনের কোন্ কথা বা ঘটনার কারণ দিতে পারে? তবে ভাই অদৃষ্টের এত নিন্দা কর কেন? হিন্দুর অদৃষ্ট তত্ব তোমরা ত ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর না। তাই বলি, দিন কতক "ঊনবিংশ শতাব্দী" ও "বিজ্ঞানের প্রখর আলো" প্রভৃতি কতক গুলি বড় বড় বাষ্পময় কথা ভুলিলে কি ভাল হয় না?

সবই অদৃষ্ট। সেই জন্যই মাধুরী আজ অস্ফুট বিধবা। বালিকা মাধুরী আজ বিধবা। মাধুরীর আশার আকাশের সুখের পূর্ণ চাঁদ আজ কোথায়? আজ এ বাঙ্গালার কয়জন বিধবার দুঃখে অশ্রুপাত করে? আজ আমার বাঙ্গালার প্রতি ঘরে ঘরে এই রূপ এক একটী বিষাদময়ী মাধুরী মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। আজ তাহাদের সেই সুখ শূন্য নবীন জীবন কাননের প্রতি ফুলে জীবনগ্রাসী মৃত্যু-কীট বাস করিতেছে। বালিকা বিধবার স্নেহ ভিক্ষা পূর্ণ নীরব পবিত্র কটাক্ষের অর্থ আমাদের দেশের বহুদর্শী সমাজ সংস্কারকেরা ইচ্ছা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন না। বালিকা বিধবার অর্থ পূর্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস ও জগতে অতুলনীয়-

সেই পবিত্র নীরব রোদনের কি কোন মূল্য নাই ? সত্য কথা বলিতে গেলে বাঙ্গালি-বিধবার অবস্থা ভিত্তি-শূন্য।

মাধুরী বাঙ্গালী ঘরের বিধবা ; সমাজের দাসী। তাহার ইহকালের সকল সুখ-আশাও অস্তমিত। কেন তবে মাধুরীর চাঁদ মাধুরীর হৃদয় শূন্য করিয়া অতীতে লুকাইল ? কই, মাধুরী ত ধরিয়া রাখিতে পারিল না !—প্রকৃতির এ চাতুরী—এ রহস্য কে বুঝিবে ! ঠিক কথা। আমরা ত এ জগতের বিদেশী, দুদিনের জন্য আসিয়াছি। আমাদের প্রকৃত গৃহ সেই প্রেমময়ের অনন্ত প্রকৃতি রাজ্যে।

অদৃষ্ট ক্রমে মাধুরীর হৃদয়-প্রান্তরে কোথা থেকে এক ক্ষুদ্র, এক স্নেহের ক্ষুদ্র নদী দেখা দিল। সেই ক্ষুদ্র নদী কি এক মধুর রব আনিয়াছে, যাহা শুনিয়া মাধুরীর হৃদয়ের মৃত কুঁড়ি গুলি আজ কত দিনের পর আবার ফুটিয়া উঠিল। মাধুরীর মনও সেই নদীর মধুর রবের সহিত মিশিল। একি হইল ? মাধুরীর হৃদয়ের তীর হইতে এক কি-যে মত্ততা সুর উঠিয়াছে, বালিকা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। অথবা বুঝিতে পারে নাই বা কেন বলি। মাধুরী নির্জ্জনে আপনার মনে ভাবিতেছে—"এ সংসারে আমি কে ? আমি যে পরিত্যক্ত ফুল। আমার প্রতি তাঁর এত উদারতা কিসের ? আমার ত কোন গুণ নাই। তবুও তিনি আমার দুঃখে এত অশ্রু পাত করেন কেন ? আর কেহ ত একবারও আমার দিকে করুণার নয়নে চায় না ? তাঁর গুণের সীমা নাই। তিনি কি ? হায়! আমি যে আর আপনার নাই।" এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে মাধুরীর উপর ঘুম-ঘোর-মগ্ন চক্ষু দুটী অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল।

বালিকা হৃদয় প্রেমময়। বালিকার নির্ম্মল প্রেমময় হৃদয়ের অতি নিভৃত প্রদেশে একবার যে ছবি অঙ্কিত হইবে, তাহার ছায়া বালিকার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শিরায় শিরায় জাগিতে থাকিবে। সে পবিত্র প্রেমের মূলে কুঠারাঘাত করিবার ক্ষমতা নিষ্ঠুর স্বার্থপর সমাজের কিছুই নাই। এ সংসারে নারীইত জীবন্ত স্নেহমূর্ত্তি ও পবিত্র প্রেম-গঙ্গা-জননী। নারীই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের সজীব মূর্ত্তি।

ঘটনার স্রোত কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। কাল সুপ্রসন্ন—অনুকূল বাতাস বহিতেছে। কি করিয়া ঠিক জানি না, এমন একদিন আসিল, যখন মাধুরীর সহিত তাহার ইহলোকের দেবতা—হৃদয়ের হার, আর আমার বাঙ্গালী সমাজে অতুলনীয় এক জ্যোতির্ম্ময় যুবকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। প্রেমিক প্রেমিকের মিলন। সে মিলনের তুলনা এ জগতে নাই। তখন দুইটী আত্মার এক হইয়া সেই জগৎ অতীত আত্মায় লীন। কি চমৎকার জাগ্রত স্বপ্ন। এই রূপ কতক্ষণ ছিল, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। যখন উভয়ের আত্ম বিসর্জ্জন-পৃষ্ঠ-বিহারিণী অনন্ত সুখ ও মিলনের ঘুম ভাঙ্গিল, তখন যুবকের মুখ ফুটিল—"সব প্রস্তুত ; সরল প্রাণে দুঃখ দেওয়া কি উচিত ? আচ্ছা, তুমি আমাকে কি—" এই কথার মধ্যে বাধা দিয়া মাধুরী সেখান হইতে চকিতের মধ্যে উঠিয়া গেল। আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে তথায় আসিল। এবার তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, স্বর অতি মৃদু, অতি স্নেহময়—অতি অস্পষ্ট। সেই অস্পষ্ট স্বরে

ইহ জগৎ নিস্তব্ধ হইয়া বলিতে লাগিল—"কেন জন্মেছিলাম! জন্মিলাম যদি ত তোমাকে দেখিলাম কেন! কই, দেখিয়াও ত আশা মেটে না। আরও যেন—আমি কি দুর্ব্বল!" এই বলিয়া সেই অতুলনীয়া সুন্দরী মাধুরী মাথা নত করিল।

তখন যুবক কি করিলেন? আর স্থির হইয়া থাকিতে না পারিয়া মাধুরীর সুন্দর অতি মধুর হাত দুই খানি আপনার হাতে লইয়া বলিতে লাগিলেন—"কি বুঝাব তোমায় মাধুরি! বুঝাবার ভাষা নাই—শক্তি নাই। এক বৎসর তোমার স্বপ্নময়ী স্মৃতি আমার চির সহচরী ছিল। এক বৎসর আমার চির চঞ্চলময়ী স্মৃতি তোমাময় হইয়াছিল। এ দুই চোকে ভাল করে এ পৃথিবী দেখি নাই। কেবল কল্পনাময় মাধুরী-জগৎ ভ্রমণ করেছি।"

ইহার উত্তরে, মাধুরী অতি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"ভাই, এ জীবনের পর পারে তুমি রয়েছ; তোমার সঙ্গে মিশিবার শক্তি, আমার কৈ! আমি যে সমাজের স্বার্থের অধীন। সমাজ যে ব্যক্তির দিকে চায় না! এ মিলনে যে তুমি সমাজচ্যুত হইবে! আমার ছাই সুখের জন্ম তোমার সুখের দ্বার বন্ধ করিব কেন? আমি ত ডুব্‌চি; আমাকে তুল্‌তে গিয়ে তুমি ডোব কেন?—এ হৃদয় শূন্য! যত দিন বাঁচিব, এই শূন্য হৃদয়ের মন্দিরে তোমার অশরীরী প্রতিমার নিশি দিন পূজা করিব। দূর মিলন, বড় মধুর—বড় পবিত্র।"

যুবক একবার সমাজ ও জগতের দিকে চাহিয়া যে গম্ভীর কথাগুলি বলিলেন, তাহা কি আমার বাঙ্গালার পাঠকদের চক্ষু খুলিয়া দিবে না? যুবক উত্তর দিলেন, "মাধুরি, সমাজ কে? এ যথেচ্ছার স্বার্থপর সমাজের শাসন আমি মানি না। আমাদের এ মিলন সেই মহাশক্তির নিয়মের ফল। এ মিলনে আমার আমিত্ব কোথায়? আমাদের মিলনের পুরোহিত সত্য স্বয়ং। এমিলনের উপর সমাজের কোন হাত নাই। এস, মাধুরি এস, আজ এই ভস্মাবশেষ সমাজের উপর দাঁড়াইয়া তোমার পাণি গ্রহণ করি। এস মাধুরি, এই প্রলয়ের রাজ্যে আমাদের এক মাত্র ধ্রুব সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করি। আজ আমি স্বার্থ পরিবর্জ্জিত সমাজের গোড়ায় দাঁড়াইয়া বলিতেছি যে, সত্যই আমাদের এক মাত্র আদর্শ। সমাজ কে? আমি কে? তিনিই সব।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

# ভবভূতি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রামচন্দ্রের বনগমনের পর বহুদিন অতীত হইল। পুত্রবৎসল রাজা দশরথ উপযুক্ত পুত্রের নির্ব্বাসন-ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া বিষাদে প্রাণত্যাগ করিলেন; তাঁহার মৃত্যুতে এবং রামচন্দ্রের বনগমনে অযোধ্যাপুরী নীরব হইল। আলোক সমুজ্জ্বল রাজভবন, অন্ধকারময় পরিত্যক্ত আগারে পরিণত হইল। যে বিষাদময়ী রজনীতে দশরথ কৌশল্যার নিকট মুনিশাপের কথা বিবৃত করিয়া, চিরদিনের জন্য তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন, যেন সেই করাল নিশার ছায়া অযোধ্যার নরনারী-

তন্ত্র সকলেই অবগত আছেন। ভবভূতি সেই জন্য অনেক স্থলেই এরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছেন, কিন্তু সে বিষয়ে আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া আমরা এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিব।

পরস্পর অভিবাদন এবং কুশল প্রশ্নের পর সম্পাতি জটায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস জটায়ু, কালক্রমে রামচন্দ্রের পিতৃমরণ শোক একটু মন্দীভূত হইয়াছে ত?" "আমি নিরামিষ মাংসে পরিতৃপ্ত গৃধ্রগণের মুখে অবগত হইয়াছি যে, রামচন্দ্র চিত্রকূট হইতে শরভঙ্গের আশ্রমে গমন করিয়াছেন, এবং শরভঙ্গের অগ্নি প্রবেশের পর, সেখান হইতে অগস্ত্য প্রভৃতি মুনিগণের নিকট গমন করিয়াছেন। জটায়ু রামচন্দ্রের কুশল সংবাদ নিবেদন করিয়া বলিলেন, "রাম এক্ষণে অগস্ত্য ঋষির আদেশে পঞ্চবটীতে বাস করিতেছেন।" সম্পাতি শুনিয়া বলিলেন "হাঁ, জন স্থানে গোদাবরী তীরে পঞ্চবটী নামক স্থান আছে বটে, কিন্তু ভাই, অনেক কালের কথা বলে আমার আর এখন সে সকল কথা স্মরণ হয় না।" জটায়ু অগ্রজের কথা শেষ হইলে বলিলেন "দাদা, শুনেছেন, কামুকী শূর্পণখা একদিন পাপাভিলাষে রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হয়েছিল"। সম্পাতি, জটায়ুর কথায় বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "সে কি? সে হতভাগিনীর যে বয়সের শেষ নাই? দুগ্ধপোষ্য বালক রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হ'তে কি তার একটুকু লজ্জা বোধ হল না?" এইরূপ কথোপকথন ক্রমে জটায়ু অগ্রজের নিকট শূর্পণখার শাস্তি, এবং খরদূষণ বধ প্রভৃতি সমস্ত বিষয় নিবেদন করিলেন। সম্পাতি শুনিয়া বলিলেন, "ভাই জটায়ু, রাবণ মহাক্ষ, মায়াবী এবং অমিতপরাক্রম; সে যে অনায়াসে ভগিনীর এইরূপ অপমান এবং জ্ঞাতি বিনাশ উপেক্ষা করিবে, তাহাতে আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। রাম এবং লক্ষ্মণ উভয়েই বালক, তুমি সর্ব্বদা অতি সাবধানে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবে। এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে না। আমিও তাঁহাদিগের মঙ্গলের জন্য সমুদ্রে স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া ইষ্টমন্ত্র ধ্যান করিব।" সম্পাতি এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলে জটায়ু আকাশ মার্গে উড্ডীন হইলেন। এই সকল স্থলে ভবভূতি অত্যুক্তি বর্ণনায় বাল্মীকিকেও অতিক্রম করিয়াছেন। জটায়ু দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, রামচন্দ্র একটী চিত্র মৃগের অনুসরণ করিতেছেন, লক্ষ্মণ তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছেন, আর রাবণ পরিব্রাজক বেশে রামচন্দ্রের উটজে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি রাবণকে সম্বোধন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "পৌলস্ত্য, পৌলস্ত্য, তুমি প্রলয় কালের বেদ রক্ষক মহাত্মাগণের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, বৈদিক ক্রিয়া কলাপ তোমার অবিদিত নাই, তুমি যমেরও জেতা, কিন্তু তোমার এই ব্যবহার?" রাবণ জটায়ুর আহ্বানে উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন জটায়ু ক্রোধ-প্রদীপ্ত হইয়া, তাঁহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য তাঁহার উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

ভবভূতি কোন স্থলেই রঙ্গভূমিতে যুদ্ধের দৃশ্য অবতারিত করেন নাই। জটায়ু এবং রাবণের যুদ্ধ ও তিনি দর্শকগণকে দেখিতে দেন নাই, কিন্তু সে যুদ্ধের পরিণাম কি হইল, তিনি স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিয়া তাহা দর্শক ও পাঠকগণের গোচর করিয়াছেন।

জটায়ু রণভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পরই আমরা দেখিতে পাই, লক্ষ্মণ এবং রামচন্দ্র সেখানে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণ সীতার অদর্শনে শোকাকুল; সীতার রূপ ও গুণ স্মরণ করিয়া এবং তাঁহার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কথা চিন্তা করিয়া তিনি ব্যথিত। কিন্তু রামচন্দ্রের হৃদয়ে বিষাদ নাই। তাঁহাকে দেখিয়া লক্ষ্মণের বোধ হইল, যেন মূর্ত্তিমান ক্রোধ অথবা জঙ্গম শোকাগ্নি কানন মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন। রামচন্দ্রের তাৎকালিক হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিবার নয়। তাঁহার হৃদয়ে শোক অথবা অবসাদ নাই, কিন্তু তাহা লজ্জা, নির্ব্বেদ এবং পরিবেদনায় পরিপূর্ণ। তিনি শতবার আপনাকে ধিক্কার দিতে ছিলেন। লোকে আত্মীয়, স্বজন, অনুগত, সকলকে রক্ষা করিতে পারে, আর তিনি একমাত্র পত্নীকেও রক্ষা করিতে পারিলেন না, এ চিন্তা বজ্রনির্ম্মিত কীলকের ন্যায় তাঁহার হৃদয় ভেদ করিতেছিল; তাঁহার বোধ হইতেছিল যেন তিনি ঘোরতর অন্ধতমসে নিমগ্ন হইতেছেন। একে পিতৃশোক তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল; তাহার উপর দীনা সীতার অবস্থা আজি কি হইল? এ চিন্তায় তাঁহার মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ হইতেছিল। তিনি বলিতেছিলেন:—

"ন্যক্কারো হৃদিবজ্রকীলইবমেতীব্রঃ পরিস্পন্দতে,
ঘোরেঽন্ধে তমসীব মজ্জতিমনঃ সংমীলিতং লজ্জয়া।
শোকস্তাত বিপত্তিজো দহতি মাং নাস্ত্যেব যস্মিন্ ক্রিয়া
মর্ম্মাণীব পুনঃ ভিনত্তি করুণা সীতাং বরাকীং প্রতি॥

লক্ষ্মণ অগ্রজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আর্য্য! আপনার ন্যায় মহাত্মাগণ কখন বিপদে অভিভূত হন না"। রামচন্দ্র সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "বৎস, আমি একি করিলাম? যাহারা সমগ্র ত্রিভুবন রক্ষা করিয়াছিলেন, সূর্য্যবংশ প্রদীপ মহাপরাক্রম সেই মহাত্মাগণের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমি একি করিলাম? আমার ব্যবহারে সেই মহাপুরুষগণ অপমানিত হইলেন, কল্পান্তজীবী সাধু জটায়ু প্রাণত্যাগ করিলেন। সীতাকে বনে বিসর্জ্জন দিয়া জগতে কখনও যাহা কেহ করে নাই, আমি সেই সকল গর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলাম।" (১) আমরা বলিয়াছি যে রামচন্দ্রের হৃদয় নির্ব্বেদ এবং পরিবেদনায় পরিপূর্ণ, কিন্তু তাহাতে অনুতাপেরও অসদ্ভাব নাই। সীতাহরণ যে তাঁহারই অবিমৃষ্যকারিতার পরিণাম, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এবং ধার্ম্মিক জটায়ু যে তাঁহারই অনবধানতা রূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে যাইয়া, জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, সে কথাও তাঁহার বোধগম্য হইয়াছিল। তাঁহার হৃদয় জটায়ুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইল। উভয় ভ্রাতায় কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর, লক্ষ্মণ অগ্রজকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য বলিলেন, "আর্য্য, এক্ষণে সেই দুরাত্মার সমুচিত শাস্তি প্রদান করিয়া আর্য্যা লাভ করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য।" রামচন্দ্র বলিলেন, ভাই, "সে বিষয়ে কি আর বক্তব্য আছে?

(১) যৈস্ত্রাতঙ্কুলোত্তমানি ভুবনান্যস্থানম মহাতীব্র স্তে সূর্য্যান্বয়কেতবো নৃপতয়ঃ পূর্ব্বে তিরস্কারিতাঃ।
কল্পান্তেষপি যঃ স্থিতঃ স্বামিতঃসাধু জটায়ুরিবং
পত্নীং স্বায়ত্তা বনে বরকৃতং লোকৈঃ কৃতং তন্ময়া॥

পূর্ব্ব হইতেই নানা কারণে রাক্ষস বধের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম, তাহার উপর ত আজি আবার এই অত্যাচার; কেবল রাবণকে নিধন করিলেই হইবে না, তাহার সবংশে শাস্তির প্রয়োজন।" উভয় ভ্রাতার এইরূপ কথোপকথনের পর, সীতার অন্বেষণে উন্মত্ত শ্বাপদ সঙ্কুল দক্ষিণারণ্য ভূভাগে প্রবেশ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। অকস্মাৎ দূরে শ্রুত হইল,"কঃ কোঽত্রভোঃ! পরিত্রায়তাং পরিত্রায়তা মামনেন দুরাত্মনা রাক্ষসকবন্ধেনা কৃষ্যা মানা মরণো স্থিরম্।"

অহং হি শ্রমণানাম সিদ্ধাশ্রম তাপসী।
মতঙ্গাশ্রম বাস্তব্যা রামান্বেষিণ্যুপাগতা ॥"

রামচন্দ্র শুনিবামাত্র লক্ষ্মণকে তাঁহার রক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন। লক্ষ্মণ অল্প ক্ষণের মধ্যেই কবন্ধকে বিনষ্ট করিয়া শ্রমণাকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রমণা রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "দেব, বোধ হয় রাক্ষসরাজ রাবণের কনিষ্ঠ বিভীষণের নাম আপনি অবগত আছেন, তিনি আপনার নিকট এই লিপি প্রেরণ করিয়াছেন।" রামচন্দ্র শুনিয়া লক্ষ্মণকে পাঠ করিতে আদেশ করিলেন; লক্ষ্মণ তাহা পাঠ করিলেন, তাহাতে এইরূপ লিখিতছিল;—

"বিশিষ্ট ভাগ ধেয়ানাং; দ্বয়ীনঃ পরমাগতিঃ।
ধর্ম্ম প্রক্রুয্যমানো বা গোপ্তা ধর্ম্মজ্ঞ বা ভবান্।"

বিভীষণ লিখিয়াছিলেন, 'যাহারা আমাদিগের ন্যায় হতভাগ্য, সংসারে তাহাদিগের দুইটীমাত্র অবলম্বন! প্রথম সম্যক সম্বর্দ্ধিত ধর্ম্ম অথবা ধর্ম্মরক্ষক আপনার ন্যায় মহাত্মা। রামচন্দ্র শুনিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন "বৎস, প্রিয় সুহৃদ লঙ্কেশ্বর মহারাজ বিভীষণের পত্রের কি উত্তর প্রদান করিব?" লক্ষ্মণ বলিলেন, "যখন প্রিয় সুহৃদ এবং লঙ্কেশ্বর মহারাজ বিভীষণ এরূপ বলিয়াছেন, তখন আর উত্তর প্রদানের অবশিষ্ট কি?" শ্রমণা লক্ষ্মণের উত্তরে অনুগৃহীতা হইলেন। ইহার পর রামচন্দ্র শ্রমণার মুখে অবগত হইলেন যে, ঋষ্যমূখ পর্ব্বতে সুগ্রীব, বিভীষণ হনুমান প্রভৃতি মহাত্মাগণ সীতার অনসূয়া নামাঙ্কিত উত্তরীয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রণয়ীর নিকট প্রিয়জনের সম্পর্কের একটী কেশ পর্য্যন্তও প্রীতিকর। রামচন্দ্র যখন শুনিলেন যে, সুগ্রীব প্রভৃতি সীতার ব্যবহার্য্য উত্তরীয় প্রাপ্ত হইয়া সযত্নে রাখিয়া দিয়াছেন, তখন তাঁহার হৃদয় সেই সকল অকারণ সুহৃদ মহাত্মাগণের প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইল। তিনি তাহাদিগকে দেখিবার জন্য এবং তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য উৎসুক হইলেন। এই সময় কাননের দক্ষিণ ভাগে অতি প্রবল অগ্নিশিখা দৃষ্ট হইল, রামচন্দ্র দেখিবামাত্র বিস্মিত হইয়া শ্রমণাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রমণা বলিলেন, "কুমার লক্ষ্মণ যোজনবাহু কবন্ধ রাক্ষসের দেহ দগ্ধ করিবার জন্য চিতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহারই শিখা আপনার দৃষ্টিগোচর হইতেছে।" রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন।

এইস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, আমরা দুই একটী কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভবভূতির সময়ে যে রঙ্গভূমির অনেক উন্নতি হইয়াছিল এবং তিনিও যে কেমন করিয়া রঙ্গস্থিত দর্শকগণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে হয়, তাহা বিলক্ষণই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সেই কথার উল্লেখ করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য।

যাহাতে হৃদয়ে অকস্মাৎ বিস্ময় অথবা ভীতির সঞ্চার হয়, সেইরূপ দৃশ্যের অবতারণা করিতে পারিলেই নাটককার প্রায় রঙ্গভূমিতে কৃতকার্য্য হন্। কি আধুনিক, কি প্রাচীন, প্রত্যেক নাটককারই এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার জন্য সাধ্য মত প্রয়াস পাইয়াছেন। ভবভূতিও তাহা বুঝিয়া স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে তাহার অবতারণা করিয়াছেন। হঠাৎ নিবিড় অন্ধকারময় কাননের মধ্যে আলোক রাশি সমুত্থিত হইল, সেই অন্ধকার মিশ্রিত আলোকে ভীষণাকার রাক্ষসের অর্দ্ধদগ্ধ কলেবর দর্শকগণের চক্ষুতে পতিত হইল, আবার তৎক্ষণাৎ ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ড সঞ্চালনের বলেই যেন সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইল, এবং সেই শ্মশানালয় হইতে তেজঃ প্রদীপ্ত দিব্য পুরুষ আবির্ভূত হইলেন, এ সকল দৃশ্য যে অভিনয় দর্শক ব্যক্তিগণের নিকট কিরূপ বিস্ময়কর, তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। আমরা এস্থলে ইহার প্রসঙ্গমাত্র করিলাম। উত্তর-চরিত্র সমালোচনের সময় ইহার সবিস্তর সমালোচনা করিব।

দিব্যপুরুষ চিতানল হইতে সমুত্থিত হইয়া রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিলেন এবং আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন, "আমি মাল্যবানের আদেশে আপনার বিনাশের জন্য এই কানন মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলাম, কিন্তু আপনার অনুগ্রহে আজ শাপ হইতে মুক্ত হইলাম। আপনার প্রসাদে আজ অস্ত্রের পরোক্ষ বস্তুও আমার অবিদিত নহে। মাল্যবান আপনার বিনাশের জন্য বালীকে অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন, তিনিও রাবণের প্রতি মৈত্রীতা নিবন্ধন আপনাকে বধ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আপনার গোচরার্থে একথা আপনার নিকট নিবেদন করিলাম।" রামচন্দ্র দিব্য পুরুষের কথায় বিন্দুমাত্রও বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না, বালীর ন্যায় মহাবীর, তাঁহার বধের জন্য কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, একথায় তাঁহার উদ্বেগ মাত্র জন্মিল না। তিনি প্রকৃতস্থের ন্যায় কেবল মাত্র বলিলেন, তাদৃশ মহাত্মাগণ কখনও সুহৃৎ কার্য্যে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে পারেন না। ভদ্র, আমি তোমার সংবাদ প্রদানরূপ সৌজন্যে প্রীত হইলাম, প্রার্থনা করি, তুমি তোমার উপযুক্ত লোকে আনন্দ অনুভব কর। রামচন্দ্রের উত্তরে সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং দিব্য পুরুষও তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ক্রমশঃ

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

---

## পাপের অনন্তত্বে আমি।

পৃথিবীর উত্তাপ এড়াইবার জন্য আমি ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না। নিভৃত শয়নকক্ষেই মস্তক রাখি, আর সুশীতল বটছায়াতেই বিশ্রাম মাগি, কিছুতেই পৃথিবীর কোলাহল—পৃথিবীর উষ্ণ নিঃশ্বাস—ঘৃণা-বিদ্বেষের দারুণ উত্তাপ আমাকে পরিত্যাগ করিল না। এখন আমি কোথায় যাই—এখন আমি কি করি? পৃথিবীতে এমন সুহৃদ কে আছে, যে কষ্ট

স্বীকার করিয়া বলিয়া দিবে, আমি কি করি ?

আমার অবস্থা, ভাই পাঠক, তোমাকে কিছু খুলিয়া বলিতেছি। আমি বড় পাপী। আমার প্রতি নিশ্বাসে, প্রতি প্রশ্বাসে, প্রতি শোণিত বিন্দুতে পাপ,—কেবল পাপ—অনন্ত পাপ বিমিশ্রিত—বিজড়িত। যেটীকে যখনই পাপ বলিয়া বুঝিতেছি, তখনই সেটীকে পরিত্যাগ করিতেছি—কিন্তু একটী পরিত্যক্ত হইতে না হইতে দশ দিক হইতে দশটী আসিয়া ঘেরিতেছে। যত দূর করি—ততোধিক আক্রমন। একটী ছাড়ে, দশটী আসে। দশটী যায় ত শতটী আশ্রয় লয়। এমনই করিয়া আমি যতই পাপাসুরদিগকে দমন করিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছি, রক্তবীজের গোষ্ঠি ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। অনন্ত পাপ কুণ্ডে—অনন্ত অভাব সাগরে আমি পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। এই বিশাল অনন্তের হস্ত হইতে যে আমি রক্ষা পাইব, আমার সে আশা কখনও ছিলনা, আজও নাই। এই ত আমার অবস্থা। কিন্তু কাহার অবস্থা আমার ন্যায় নহে। যতই পাপ বোধ জন্মিবে, ততই নূতন পাপের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। আজ একটীকে পাপ বলিয়া বুঝিতেছি, কল্য দশটী বুঝিব—দশটী বুঝা শেষ হইতে না হইতে শতটী। পাপ-বোধ একবার জন্মিলে আর তাহার শেষ নাই। কিন্তু এই ত জঘন্য চরিত্র—পাপ-কীট আমরা হইয়াছি, আমরা আবার কত অহঙ্কারে মত্ত! ছোট পাপী আবার অহঙ্কারস্ফীত বক্ষে কত বড় পাপীর প্রতি ঘৃণা কটাক্ষপাত করিতেছে। পাপীদলের আবার বড় ছোট কি? বরং ইহাই ঠিক, যে বড়-ধার্ম্মিক সেই বড় পাপী, কারণ তাঁহার পাপ-বোধ সকলের অপেক্ষা অধিক। কিন্তু পৃথিবীর ব্যাখ্যা সেরূপ নহে। পাপীই, পাপীকে ঘৃণা করিতেছে! অমুকে ব্যভিচারী,—অমুক পরনিন্দুক—অমুক কপটাচারী, এই প্রকার কত ভেদাভেদের সৃষ্টি করিয়া কত ঘৃণা,—কত উরুদ্ধ বৃদ্ধি করিতেছি। কিন্তু একবারও ভাবিতেছি না যে, আমার পাপ-বোধই অন্যের পাপ বোধের কারণ নহে। আমি আজ যেটীকে পাপ বলিয়া বুঝিয়াছি, অন্য সকলেও যেঠিক সেইটীকেই পাপ বলিয়া বুঝিতেছে, ইহা ঠিক নাও হইতে পারে। উন্নতির তারতম্যানুসারে পাপ-বোধের তারতম্য জন্মিবেই জন্মিবে। যিশুখ্রীষ্ট যাহাকে পাপ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, আমি হয়ত সে সকলকে বর্ত্তমান অবস্থায় পাপ বলিয়া মোটেই ধারণা করিতে পারিতেছি না। এই প্রকারে এমন অনেক পাপ আছে, যাহা তুমি ও আমি দুই ভিন্ন চক্ষে দেখিতেছি। এমন অনেক ঘটনা আছে, যাহা তোমার ও আমার নিকট দুইবিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মানুষের রুচি, প্রবৃত্তি যেমন ভিন্ন ভিন্ন, বুদ্ধি ও ধারণা শক্তিও তেমনি পৃথক পৃথক। মানুষের উদ্দেশ্য পৃথক, কর্ত্তব্য পৃথক, মত পৃথক। পৃথকত্ব ঘুচিয়া যাইবে যে দিন, সেই দিন তোমার পাপ আমার নিকট হয়ত পাপ বলিয়া বোধ হইতে পারে; নচেৎ নহে। তুমি বলিবে, কেন, এমন ত অনেক পাপ দেখিতেছি, যাহাকে তুমি ও আমি এক বাক্যে পাপ বলিতেছি। আমি বলি, তাহা অসম্ভব। পৃথিবীর তীক্ষ্ণ শাসন—মুখ-চাওয়া চাওয়ি-ভাব, সকল ভুলিয়া যাও, তবে বুঝিবে, বাস্তবিক

পৃথিবী যাহাকে পাপ বলিতেছে, তাহা তোমার আমার নিকট সকল সময়ে পাপ নাও হইতে পারে। পৃথিবীর প্রচারিত পাপকেই যে সকলে পাপ বলিয়া ব্যাখ্যা করে, সে কেবল ভয়ে; পাপবোধে নহে। যে পাপে বোধ জন্মে, সে পাপ আর মানুষ করিতে পারে না। পাপ বোধ জন্মে না; অথচ মুখে পাপ স্বীকার করে বলিয়াই মানুষ পাপে লিপ্ত হয়। পাপ-বোধ না হইলে, পাপ, মানুষের নিকট পাপ নহে। এমন কোন ঘটনা নাই, যাহা সকল সময়েই পাপ। যাহাতে মানবের আত্মার অপকার হয়, তাহাই পাপ। কোন্‌টী কখন কাহার নিকট পাপ, তাহা বিবেক স্পষ্ট বলিয়া দেয়। আমার বিবেক যাহাকে পাপ বলে না, সময় বিশেষে তোমার বিবেক তাহাকে পাপ বলে বলিয়াই তাহা পাপ নহে। হিন্দু এবং খ্রীষ্টানের বিবেক কত বিভিন্নপথগামী! সুধা, একসময়ে সুধা, এক সময়ে গরল। গরল, আবার ঘটনা পরম্পরায় এক জনের নিকট সুধার ন্যায় হইতেছে। মুখে পাপ পাপ বলা, ও হৃদয়ে পাপ-বোধ এক কথা নহে। আবার বলি, পাপ বোধ জন্মিলে, মানুষ আর সে পাপে কখনই লিপ্ত হইতে পারে না। যতদিন যেটায় পাপ বোধ না জন্মে, ততদিনই সেটাকে মানুষ আদর করে; যখন পাপ বোধ জন্মে, তখনই তাহাকে পরিত্যাগ করে। অন্যের মুখে শুনিলেই পাপ বোধ হয় না। পৃথিবীর সাধু লোকেরা মিথ্যা কথা বলাকে পাপ বলিয়া গিয়াছেন। আমিও বলিতেছি, মিথ্যা বলা পাপ। বলিতেছি বটে, কিন্তু হাজার বার হাজার মিথ্যা কথা বলিতেছি। এই যে আমি মিথ্যা কথাকে পাপ বলিতেছি, ইহাই পাপ-বোধ নহে। পাপবোধ ভিতর হইতে যখন জন্মে, তখন মানুষ আর তাহাতে লিপ্ত থাকিতে পারে না। এই জন্যই বলিতেছি, পৃথিবীর লোকেরা যে কার্য্য করিতেছে, আমার নিকট তাহা পাপ হইতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর লোকদিগের নিকট তাহা পাপ নাও হইতে পারে। চৈতন্য আমাপেক্ষা অনেক উন্নত ছিলেন, তিনি যদি জীবিত থাকিতেন, তবে হয়ত বুঝিতেন যে, আমি যাহা করিতেছি, সে সকলই পাপ কার্য্য। কিন্তু না বুঝিয়া আমি যাহা করিতেছি, তাহা আমার পাপ কার্য্য নহে, আমি যাহাকে পাপ বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহা না করাই আমার ধর্ম্ম। না করাই কি? যেখানে যে বিষয়ে পাপ বোধ হয়, সেখানে সে বিষয়ে লিপ্ত থাকা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। যেখানে বোধ নাই, সেখানে পাপও নাই। অজ্ঞাত অবস্থায়, অবোধ অবস্থায় মানুষ যাহা করে, তাহা কখনই পাপ হইতে পারে না। পাপ ঘটনা নহে, পাপ মনের একটী অবস্থা মাত্র। উন্নতির তারতম্যানুসারে মনের অবস্থা ভিন্ন রূপ হয়। বিবেক তখন উজ্জ্বল হয়। এই মনের অবস্থা যাহার যেরূপ, সে পাপকেও সেইরূপ দেখে। যে পাপ, একজনের নিকট মহা পাপ, তাহাই একজনের নিকট পুণ্য হইতে পারে। হইতে পারে নহে; তাহা পৃথিবীতে অনেক স্থলে পুণ্য হইতেছে। সরল বিশ্বাসের জন্য মানুষ কখনও দণ্ডী হইতে পারে না। বিবেকের স্পষ্ট আদেশে যে যাহা সরল ভাবে বুঝিতে পারে, তাহা পালন করিলেই তাহার পুণ্য হয়। যে পাপে বোধ জন্মে, সেরূপ পাপ মানুষ আর করে না বটে, কিন্তু আরো দশটীকে তখন পাপ বলিয়া বুঝিতে

পারে। তুমি অধিক পাপী, কি আমি অধিক, তাহা তোমার আমার ভাবিবার অধিকার নাই—ভাবিবার শক্তি নাই। কারণ তোমার পাপ আমার নিকট পাপ বলিয়া বোধ নাও হইতে পারে, এবং আমার পাপ তোমার নিকট পাপ বলিয়া বোধ নাও হইতে পারে। স্থির ভাবে যখন ভাবিয়া ও চিন্তা করিয়া দেখি, তখন বুঝিতে পারি যে, আমরা কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারি না। সামান্য দৃষ্টান্তেই আমরা পরাস্ত হইয়া যাই। আমরা সকলেই অন্নাহার করিতেছি, কিন্তু এই অন্নাহারে তোমার শরীরে যে উপকার হইতেছে, আমার শরীরেও সে ঠিক তেমনিই হইবে, কোন বিজ্ঞান তাহা নিশ্চয় বলিতে পারে না। যে ঔষধ খাইয়া তোমার অদ্ভুত উপকার হইতেছে, সেই ঔষধ সেবনেই আমার অনিষ্ট হইতে পারে—ইহা প্রতি দিনের ঘটনা। এই জন্যই বিজ্ঞান আজও এ সকল বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারিল না,—এই জন্যই চিকিৎসাশাস্ত্র আজও অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইতেছে। আমরা এই হিসাবে জগৎকে দেখিলে, পাপী আর পুণ্যাত্মা, এই ভেদাভেদ আর থাকিতে পারে না। কে সাধু, কে অসাধু, কে পাপী, কে পুণ্যাত্মা, মানুষ আপন বুদ্ধিতে তাহা ঠিক রূপে কখনই বুঝিতে পারে না। পাপীই সময়ে মানুষের নিকট পুণ্যাত্মা হইতেছে, পুণ্যাত্মাও পাপী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন। এই রূপ নির্ণয় করিতে যাইয়া, মানুষ, কেবল অন্যায়েরই পূজা করিতেছেন, কেবল অবিচারেরই প্রশ্রয় দিতেছেন। দুঃখের বিষয়, পৃথিবী কখনও এই অন্যায়ের পূজা পরিত্যাগ করিতে পারিল না। এই অন্যায়ের প্রশ্রয় পাওয়াতেই কোন মানুষ ঈশ্বরের অবতার হইয়া পূজা পাইল, কোন মানুষের শোণিত-পাত করিয়া মানুষ রক্তপিপাসা নিবৃত্তি করিল। গুরু পূজার দিন, মানুষ পূজার দিন চলিয়া যাইতেছে, লোকেরা বলে, কিন্তু কোথায় যাইতেছে? প্রকারান্তরে, গুরুপূজা, মানুষ পূজা অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিতেছে। মানুষ, যতদিন আপন বুদ্ধির বিচারে পাপী ও পুণ্যাত্মা, সাধু ও অসাধুর বিচারে প্রবৃত্ত থাকিবে, ততদিন এভাব থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস আছে, এমন একদিন আসিবে, যখন এই অন্যায়, এই অবিচার, এই অসত্যের পূজা পৃথিবী হইতে তিরোহিত হইবে। যখন বড় ছোট, পাপী পুণ্যাত্মা, এসকল ভেদাভেদ আর মানুষ গণিবে না;—যখন সকল বস্তুতেই ভগবানের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষ দেবত্ব ও অমরত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইবে;—যখন একজন আপন বুদ্ধিতে অন্য জনের বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া স্বয়ং ভাল হইবার জন্যই ব্যস্ত থাকিবে;—যখন মানুষ অন্যের চক্ষের তৃণ না দেখিয়া নিজের তৃণ দেখিতেই ব্যস্ত থাকিয়া জীবনকে শেষ করিতে পারিবে। যখন লোক বিশাল বিস্তৃত অভাব সাগরের মধ্যে পড়িয়া যায়, তখন আর কি কিছু বিচার করিবার অবসর থাকে?—পাপ বোধ জন্মিতে জন্মিতে যখন মানুষ পাপের অনন্তত্বে নিমগ্ন হইয়াছে, বুঝিতে পারে, তখন অসম্পূর্ণ মানুষের অন্য আর কিছুই গণনার বাসনা থাকে না। তখন কেবল মনে হয়—কেমনে উদ্ধার পাইব, কেমনে রক্ষা পাইব। অকূল সাগরে পড়িয়া কে কবে অন্যের কথা ভাবিতে পারিয়াছে? পাপ বোধ জন্মিলে, নিশ্চয়ই পাপকে অনন্ত বলিয়া মনে হয়। একটুর জ্ঞান

দূষিত হইবার আর একটী কারণ আছে, তাহাও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। সেটী—দূষিত সাহিত্য। দূষিত সাহিত্যের দ্বারা সামাজিক নীতিকে যতদূর বিকৃত করে, এমন অতি অল্প কারণে করিয়া থাকে। আমরা বর্ত্তমান রঙ্গভূমিগুলিকে আমাদের যুবকদিগের নীতি-বিকারের একটী কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, কিন্তু অনিষ্ট-কারিতা সম্বন্ধে দূষিত সাহিত্যের সহিত রঙ্গভূমির তুলনাই হয় না। এক জন যুবককে রঙ্গভূমিতে যাইতে হইলে প্রকাশ্যভাবে আর দশজনের সঙ্গে যাইতে হয়; অভিভাবকগণ যদি বিরোধী হন, তবে তাহার পক্ষে গোপনে যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু একজন যুবক এক খানি কুৎসিত, বিকৃত-রুচিসম্পন্ন পত্রিকা বা গ্রন্থ দ্বার বন্ধ করিয়া পড়িতেছে, সেখানে কে তাহাকে বারণ করিবে? আমাদের বালক বালিকাগণ কোথায় কোন গ্রন্থ দেখিতেছে ও কোথায় কোন গ্রন্থ পড়িতেছে, তাহার উপর চক্ষু রাখা অভিভাবকদিগের পক্ষে সহজ নহে। এই কারণে কুৎসিত সাহিত্যের দ্বারা যে অনিষ্ট হয়, তাহা নিবারণ করা দুষ্কর। বর্ত্তমান সময়ে বড় বড় সহরে বহুজন সমাগম হওয়াতে ও গোকুলের হত্যা ও দুর্দ্দশা ঘটাতে, দুগ্ধ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই কারণে অনেক ব্যবসায়ী লোক দুগ্ধের পরিবর্ত্তে [illegible] দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া শিশু- [illegible] প্রস্তুত করি- [illegible] কিন্তু [illegible] যাছে ও তাহা [illegible] রাসায়নতত্ত্ববিৎ ব্যক্তিগণ মধ্যে মধ্যে [illegible] করিয়া দেখিয়াছেন যে, ঐ সকল [illegible] এমন দ্রব্য সন্নিবেশিত হইয়াছে, যা- আহার করাইলে শিশুদিগের দেহে উৎকট পীড়ার বীজ সকল নিহিত হইতে পারে। এইরূপে চতুর ও ধর্ম্মভয়-বিহীন ব্যবসায়িগণ তৈল ঘৃত প্রভৃতি প্রতিদিনের ব্যবহৃত সমুদায় দ্রব্যেরই নকল প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। তদ্দ্বারাও লোকের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে এই সকল প্রবঞ্চক লোককে ধরিয়া বিচারালয়ে আনয়ন করা হয়; এবং দেশের প্রচলিত রাজবিধি অনুসারে তাহাদিগের সমুচিত দণ্ডও হইয়া থাকে। আমরা যখন সংবাদ পত্রে এই সকল প্রবঞ্চনার কথা পাঠ করি, তখন আমাদের কতই ঘৃণার উদয় হয় এবং ঐ সকল লোকের দণ্ড হইলে আমরা কত পরিতোষ লাভ করি। কিন্তু যে প্রবঞ্চক ব্যবসায়ী সামান্য অর্থ লোভে মানবের খাদ্যের সঙ্গে বিষাক্ত বস্তু মিশ্রিত করে, শিশুদিগের পানীয় দুগ্ধের মধ্যে পীড়াজনক পদার্থ সন্নিবিষ্ট করে, তাহার অপেক্ষা কুৎসিত সাহিত্যের লেখক ও প্রকাশক কি কম নিন্দনীয়? একখানি কুৎসিত গ্রন্থ পাঠ করিলে বা একখানি কুৎসিত ছবি দেখিলে একজন যুবক বা যুবতীর মনে যে কি অসাধুতার বীজ নিহিত হইতে পারে, তাহা কি কেহ অনুভব বা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন? এক জন বিখ্যাত লোক বলিয়াছেন যে, তাঁহার পঠদ্দশায় তাঁহার এক জন সমাধ্যায়ী তাঁহাকে গোপনে একখানি অতিশয় অশ্লীল গ্রন্থ পড়াইয়াছিল, সেই গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় গুলি তাঁহার কল্পনাকে এতদূর দূষিত করিয়াছিল যে, তৎপরে তিনি যখন দেশ মধ্যে সম্ভ্রান্ত হইয়াছেন ও যখন নানাপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যে লিপ্ত [illegible], যখন ধর্ম্ম ও নীতির বন্ধনে তাঁহার

মন সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়াছে, তখনও মধ্যে মধ্যে সেই গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় সকল তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া তাঁহার চিত্তকে কলুষিত করিয়াছে। একজন সমাধ্যায়ী বালক অপর একটী বালককে গোপনে ডাকিয়া একখানি অতি কুৎসিত ছবি দেখাইল। সেখানি তাহার কল্পনাকে এতদূর উত্তেজিত করিল যে, জন্মের মত তাহার স্মৃতিতে ঐ ছবি খানি মুদ্রিত হইয়া রহিল। তৎপরে যখনই সেই ব্যক্তি প্রলোভনে পড়িবে, ও তাহার চিত্ত বিকার উপস্থিত হইবে, তখনই সেই ছবি স্মৃতিতে জাগিয়া উঠিবে ও সেই কল্পনাকে জাগাইয়া তুলিবে। মানবের ইন্দ্রিয় বিকারের গূঢ়-তত্ত্ব যাঁহারা নিরূপণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, মানবের পতনের পূর্ব্বে কল্পনাই তাহার পথ প্রস্তুত করে। স্মৃতি ও কল্পনাতে সুখের ছবি অগ্রে উদিত হয়, তদনন্তর মন সেই প্রলোভনে পতিত হয়। অতএব সামাজিক নীতির রক্ষা ও উন্নতি বিষয়ে যাঁহারা উৎসুক, তাঁহাদিগকে দেশের সাহিত্যের প্রতি মনোযোগী হইতে হইবে।

যুবকদিগের দুর্নীতির চতুর্ব্বিধ কারণ উল্লেখ করিয়া এখন দ্বিতীয় প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে, এই চতুর্ব্বিধ কারণের প্রতিবিধান কিরূপে করা যায়? কিন্তু এই প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে আর দুইটী বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথম, যে মানব আপনাকে আপনি রক্ষা করে, সেই সুরক্ষিত হয়। যদি আমাদের যুবক যুবতীদিগের মনে সেই সৎপ্রতিজ্ঞা প্রবল না থাকে, যদ্দ্বারা মানব এই প্রলোভন পূর্ণ-সংসারে আপনাকে সুপথে রাখিয়া চলে, তবে কি সামাজিক শাসন, কি গুরুজনের ভয়, কিছুতেই তাহাদিগকে সুপথে রাখিবে না। দ্বিতীয়ত, জনসমাজের যেরূপ অবস্থা ও ইহার সহিত আমাদের প্রত্যেকের যেরূপ সম্বন্ধ, তাহাতে ইহাতে বাস করিয়া আমাদের বালক বালিকাগণ সৎ ও অসৎ দুই দেখিবে। তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদিগকে গৃহ মধ্যে বদ্ধ রাখা সম্ভব নয়, এবং সম্ভব হইলেও প্রার্থনীয় নয়। তদ্দ্বারা কল্যাণ না হইয়া অকল্যাণই ঘটে। সদসতের সংগ্রাম ক্ষেত্রে পড়িয়া জয় লাভ না করিলে, কি পুরুষ কি রমণী, কাহারও চরিত্র সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ন্যস্ত হয় না। সুতরাং এইরূপ আশা করিতে হইবে যে, বালক বালিকাগণ যখন সমাজে মিশিবে, তখন ভাল মন্দ দুই শুনিবে, দুই দেখিবে, তাহা সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করা যাইতে পারিবে না। কিন্তু এমন কিছু ভাব তাহাদের অন্তরে প্রবল করিয়া দেওয়া আবশ্যক, যদ্দ্বারা তাহারা সৎকেই আলিঙ্গন করিবে ও অসৎকে বর্জ্জন করিবে। ইহাও সেই আপনার দ্বারা আপনাকে রক্ষা করা। আমরা সময়ে সময়ে দেখিয়াছি, একটী বালক বা বালিকা, যাহার প্রকৃতিতে অসাধুতার বীজ নিহিত আছে, দশদিন অপর দশটী সৎপ্রকৃতির বালক বালিকার সহিত বাস করিতেছে, তাহাদের সদ্দৃষ্টান্ত হইতে কোন উপকার লাভ করিতে পারিতেছে না। কিন্তু এক দিন দুই ঘণ্টার জন্য অপর একটী বালক বা বালিকার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহারও প্রকৃতি অসৎ, অমনি, চুম্বকে যেমন লৌহকে টানে, সেই রূপ দেখি, দুইটীতে মিশিয়া গিয়াছে।

এই জন্তই আমাদের দেশের একটী চলিত কথাকে বলিয়া থাকে—"আকরে টানে" অর্থাৎ যাহার প্রকৃতি যেমন পদার্থে সে সেই দিকেই আকৃষ্ট হয়।

এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে শৈশবের শিক্ষার দিকে প্রবলরূপে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্যই এই যে, আমরা শিশুদিগের অন্তরে এমন কিছু বীজ নিহিত করিয়া দিব, যাহার গুণে উত্তর কালে তাহারা সৎ ও অসৎ, উভয়ের মধ্যে সৎকেই বরণ করিবে এবং অসৎ যাহা তাহাকে ঘৃণা পূর্ব্বক দূরে পরিত্যাগ করিবে। এখন প্রশ্ন এই, শৈশবকালে কিরূপে এই প্রকার শিক্ষা দেওয়া যায়? এবিষয়ে দুইটী কথা আমাদিগকে বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথম, শিশুদিগের মনে ধর্ম্ম ও নীতির স্থূল ২ নিয়ম সকল সুদৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া দিতে হইবে। (২য়) দ্বিতীয়ত তাহাদের অন্তরে সাধুতার আকাঙ্ক্ষা প্রবল করিয়া দিতে হইবে। যদি এই দুই পদার্থ তাহাদের অন্তরে দিয়া ছাড়িয়া দিতে পারি, তবে উত্তরকালে তাহারা সংসার প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়াও ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু এ দুইটী তাহাদের অন্তরে কিরূপে নিহিত করা যায়? এবং কেহ কেহ এরূপও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, কোন গৃহস্থের গৃহ এমন আছে যেখানে শিশুদিগকে ধর্ম্ম ও নীতির স্থূল স্থূল নিয়ম সকল শিক্ষা দেওয়া হয় না? অথবা যে স্থানে তাহাদের সাধুতার পথ আশ্রয় করিতে উৎসাহিত করা হয় না? "তুমি মিথ্যা কথা বলিও না, তুমি পরের দ্রব্য চুরি করিওনা, তুমি পরশ্রী দেখিয়া কাতর হইওনা, ইত্যাদি উপদেশ কোন গৃহস্থের গৃহে সন্তানদিগকে শুনান হয় না? যে ব্যক্তি নিজে পাপাচারী, ইন্দ্রিয়াসক্ত বা দুষ্ক্রিয়ান্বিত, সেও ইচ্ছা করে যে, তাহার সন্তানগণ সে পথ আশ্রয় না করে, সুতরাং সে ব্যক্তিও নিজ গৃহের শিশুদিগকে নীতিমার্গ অবলম্বন করিবার জন্ত উপদেশ দিয়া থাকে। তবে কেন আশানুরূপ ফল দর্শিতেছে না? আমরা বহুদিন শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার প্রয়াস পাইয়া নিজেরা একটী শিক্ষা লাভ করিয়াছি। সে শিক্ষাটী এই;— বাচনিক শিক্ষা অপেক্ষা পারিবারিক পবিত্র বায়ুতে থাকার ফল অধিক, অর্থাৎ মনে কর, আমি বাড়ীর দশটী বালক বালিকা একত্র করিয়া বসাইলাম, বলিলাম, তোমরা স্থির হইয়া শুন, তোমাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে কিছু উপদেশ দিব। তাহারা গম্ভীর হইয়া বসিল; আমিও গম্ভীর ভাবে মিথ্যা কথার দোষ উল্লেখ করিয়া এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলাম। বক্তৃতা শেষ হইলে তাহারা খেলিবার জন্ত গেল, আমিও বিষয়ান্তরে গমন করিলাম। এরূপ ভাবে ধর্ম্ম ও নীতির উপদেশ দেওয়াতে যে একেবারে কোন ফল হয় না, তাহা বলি না, কিন্তু ইহাতে তাহাদের অন্তরে নীতি ও ধর্ম্মের নিয়ম সকল যেরূপ দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত না হয়, তাহারা পার্শ্বে থাকিয়া পিতা মাতার যে চরিত্র প্রতিদিন লক্ষ্য করে, তন্মধ্যে নীতি ও ধর্ম্মের জীবন্ত ভাব যদি বিদ্যমান থাকে, তদ্দ্বারা তদধিক হইয়া থাকে। শিশুরা যদি দেখিতে পায়, তাহাদের পিতা মাতার সাধুতার প্রতি আন্তরিক আদর ও অসাধুতার প্রতি আন্তরিক ঘৃণা; কেবল যে তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্তই তাহারা

সাধুতার কথা বলেন, তাহা নয় কিন্তু কোন প্রকার অসাধুতা দেখিলে তাঁহারা আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করেন এবং দেশের সম্প্রদায় সাধুলোককে আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, তবে তাহাদের মনে সাধুতার ভাব এমন দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হয় যে, তাহা তাহাদের মানসিক গঠনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়।

সংক্ষেপতঃ এই জানিতে হইবে যে, পিতা মাতা সৎ সত্য-প্রিয় ও ঈশ্বরপরায়ণ হইলে, পরিবার মধ্যে স্বভাবত যে পবিত্র বায়ু বহিয়া থাকে, তাহাতে থাকিয়াই শিশুরা নীতি ও ধর্ম্মে বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া মৌখিক উপদেশ যে প্রয়োজনীয় নহে, কেহ এরূপ মনে করিবেন না। উপদেশের অভাবে নীতি ও ধর্ম্মের নিয়মগুলি দৃঢ়রূপে তাহাদের হৃদয়ে প্রোথিত হইবে না; জনক জননীর চরিত্রে প্রকৃত সাধুতা থাকিলে ও সাধুতার প্রতি দৃষ্টি থাকিলে, সন্তানেরা স্বভাবত সাধু হইবে। কিন্তু আমরা এই প্রলোভনপূর্ণ জগতে এমন সাধুতা চাই, যাহা জন-সমাজের পাপ রাশির সহিত সংঘর্ষণে টেঁকিতে পারে। সেইরূপ সাধুতা পাইতে হইলে, শৈশব কালেই নীতি ও ধর্ম্মের নিয়মগুলিকে বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সেজন্য উপদেশের প্রয়োজন। এই উপদেশ চারি প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে।

প্রথম পরিবার মধ্যে। আর তোমাদিগকে নীতির উপদেশ দিব বলিয়া খেলা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া এক স্বতন্ত্র ঘরে লইয়া গেলাম, তাহারা গম্ভীর ভাবে বসিল, আমিও গম্ভীর ভাবে বসিলাম; তৎপরে এক ঘণ্টাব্যাপী এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করা গেল। বক্তৃতান্তে পিতা ও সন্তান উভয়েই নিষ্কৃতি পাইল। উপদেশ দিবার এ প্রণালী নহে। পরিবার মধ্যে শিশুদিগকে দুই প্রকারে উপদেশ দিতে হইবে। (১) জননী গল্পের দ্বারা উপদেশ দিবেন। উপকথা, পৌরাণিক আখ্যায়িকা, ঐতিহাসিক উপন্যাস, সাধু ও বীরদিগের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি সকল বর্ণনাদি করিয়া তিনি শিশুদিগের চিত্ত বিনোদন করিবেন; অথচ সেই সঙ্গে সঙ্গে নীতি ও ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব সকল তাহাদিগের হৃদয়ে মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করিবেন। দুর্ভাগ্য-বশত যে যে পরিবারে জননীগণ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, সেখানে শিশুদিগকে গল্প বলার প্রথা একেবারে তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। শিশুরা সন্ধ্যাকালে গল্প শুনিবার জন্ত ধরিলে শিক্ষিতা জননীরা বিষম লেঠা বলিয়া বোধ করেন ও তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। ইহার কারণ বেঙ্গমা বেঙ্গমী পাখীর গল্প, পক্ষীরাজ ঘোড়া ও তালপত্রের খাঁড়ার গল্প, একনড়ের গল্প, প্রভৃতি যে সকল উপকথা দেশ মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে, তাহা বলিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় না; নূতন ধরণও কিছু জানেন না, এই জন্য কাজেই শিশুদিগকে তাড়াইতে হয়। (২) গল্পের সঙ্গে সঙ্গে যেমন উপদেশ দিতে হইবে, সেইরূপ তাহাদের প্রতি দিনের কাজ ও খেলার সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ দিতে হইবে। যখন কোন শিশু কোন অপরাধে ধৃত হয় ও জনক জননীর নিকট শাস্তি লাভ করে, বা অপর কোন শিশুর দুষ্টতার জন্য নিজে ক্লেশ পায়, সেই সকল সময়ে তাহাদিগকে যে সকল কথা বলা যায়, তাহা তাহাদিগের বিশেষ

মনে থাকে। এই সকল সময়ে নীতি ও ধর্ম্মের মূল নিয়ম সকল তাহাদের মনে মুদ্রিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে হইবে।

দ্বিতীয়, পরিবার মধ্যে জনক জননী যে উপদেশ দিবেন, বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয়ের উপদেশে তাহা আরও দৃঢ়ীভূত হইবে। শিক্ষক মহাশয় বা মহাশয়াও যেন নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিতে অগ্রসর না হন। তাহাদিগকে প্রতি দিনের পাঠ দিতে দিতে, এমন সকল কথা আপনি উঠিবে, যাহা অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে অনেক উপদেশ দিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে। সেই সকল সুযোগ ছাড়িবেন না। তৎপরে বিদ্যালয়ে যখন তাহারা পরস্পরের সহিত মিশিবে ও খেলা করিবে, সে সময় তাহাদের প্রতিদৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহারা এমন কাজ অনেক করিবে, যাহাতে উপদেশ আবশ্যক হইবে। সেই সকল সময়ে উপদেশ দিলে তাহা চির দিন স্মরণ থাকিবে।

তৃতীয়—শিশুগণ পরিবার মধ্যে ও বিদ্যালয়ে যে উপদেশ পাইবে, তদ্ভিন্ন প্রত্যেক রবিবারে এক এক স্থানে শিশুদিগকে একত্র করিয়া নীতি বিদ্যালয় খোলা যাইতে পারে। শিশুদিগকে একত্র করিলে তাহাদের কত আনন্দ হয়। তাহারা পরস্পরের সহিত বন্ধুতা করিয়া কত সুখী হয়। এই সকল সময়েও গল্পাদির দ্বারা নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দিতে হইবে। তদ্দ্বারা নিয়ম সকল তাহাদের অন্তরে সুদৃঢ় রূপে প্রোথিত হইতে পারে।

চতুর্থ—সর্ব্বোপরি শিশুদিগের জন্য সহজ সুবোধ ভাষার পুস্তক, পুস্তিকা প্রচার আবশ্যক। এই সকল পুস্তক ও পুস্তিকার লক্ষ্য এই থাকিবে যে, শিশুরা সকল প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয়ের জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ লাভ করিবে।

এই সকল উপায়ে শৈশব কাল হইতেই বালক বালিকাদিগের অন্তরে নীতি ও ধর্ম্মের নিয়ম সকল সুদৃঢ়রূপে নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে ; তাহা হইলেই তাহারা উত্তর কালে আপনাদিগকে আপনারা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

## সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

টমকাকার কুটীর।—দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধীয় উপন্যাস ; ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ ; মূল্য ২৸০, ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত। আঙ্কেল টমস্ কেবিন নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক যিনিই হউন, তিনি আমাদিগের এবং বাঙ্গলার সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র। এই অপূর্ব্ব পুস্তক খানি নানা দেশের নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। এতদিন পরে বাঙ্গলাভাষায় পুস্তকখানিকে রূপান্তরিত দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। এইরূপ উৎকৃষ্ট পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা না করিতে পারিলে মনের ক্ষোভ মিটে না, কিন্তু নব্যভারতে নিতান্ত স্থানাভাব। আমরা আশা করি, সর্ব্ব সাধারণে এই পুস্তকখানি ক্রয় করিয়া অনুবাদকের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন। পুস্তকের ভাষা অতি প্রাঞ্জল হইয়াছে, ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। পুস্তকের মূল্য কিছু অল্প হইলে ভাল হইত। কারণ ইংরাজি পুস্তকখানি ৷৷০ হইলেই পাওয়া যায়।

স্থানাভাবপ্রযুক্ত এবারেও বহুত সমালোচনা গেল না ; গ্রন্থকারগণ ক্ষমা করিবেন।

# চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধর্ম্ম। (২য়)

## চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গসমাজের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবস্থা।

চৈতন্য জন্মিবার পূর্ব্বে বঙ্গসমাজের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবস্থা কিরূপ ছিল, তখন কোন্ কোন্ আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা ইহা পরিচালিত হইতেছিল, তাহা বলিবার পূর্ব্বে ভারতে হিন্দুধর্ম্মের উত্থান, বিস্তার ও অধঃপতন বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। সে জন্য আমরা সে বিষয়ের স্থূল-স্থূল বিবরণ বিবৃত করিয়া পরে আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা করিব।

শক্তি উপাসনাই মানব হৃদয়ের প্রথম ধর্ম্মভাব, একথা স্থির সিদ্ধান্ত। মনুষ্যের আদিম অবস্থায় জড় জগতের যে কোন পদার্থের সহিত তাহার প্রথম পরিচয় হয়, তাহাই তখন অলৌকিক ঐশীশক্তি সম্পন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়; সুতরাং তত্তৎ বস্তুকে মানুষ ঈশ্বর বোধে আরাধনা করিয়া থাকে। সমস্ত মানবজাতির আদিম ইতিহাস এই কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। আমাদের আর্য্য-পূর্ব্ব-পুরুষগণ এদেশের আদি নিবাসী ছিলেন না। যখন তাঁহারা মধ্য-আসিয়া হইতে ভারতসীমায় পদার্পণ করিলেন, তখন তাঁহারা এই ধর্ম্মভাব লইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। তজ্জন্যই আমরা ঋগ্বেদের প্রথমে "অগ্নিমীলে পুরোহিতং" প্রভৃতি সূক্ত সকল দেখিতে পাই। তাঁহারা শীত প্রধান দেশ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া অগ্নির প্রভাব ও উপকারিতা বিলক্ষণরূপে বুঝিতেন। সেজন্য তৎকালে অগ্নিই তাঁহাদের প্রধান দেবতা ছিল। পরে ভারতে আসিয়া যতই তাঁহারা প্রকৃতির বৈচিত্র্য দেখিতে লাগিলেন, শ্যামল শস্যপূর্ণ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র সকল, সুবিশাল তরঙ্গময়ী স্রোতঃস্বতী নিচয়, নানাবর্ণে সুরঞ্জিত মেঘমালা ও নানাজাতীয় সুগন্ধ ও সুন্দর কুসুমাবলী প্রভৃতি এখানকার বিচিত্র পদার্থপুঞ্জ যতই তাঁহাদের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল, তাঁহাদের দেবতার সংখ্যাও ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কালক্রমে আর্য্য ঋষিগণ বুঝিতে পারিলেন যে, অগ্নি, বায়ু, জল প্রভৃতি জড় পদার্থসকলে দেবত্ব নাই; কিন্তু ঐ সকল পদার্থের অন্তরালে এমন এক একটী শক্তি অলক্ষিত ভাবে কার্য্য করিতেছে যে, তাহারই প্রভাবে ঐ সকল ভৌতিক পদার্থ এরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতাশালী হইয়াছে। এই রূপে জড় পদার্থ হইতে জড়ের আধারভূত পৃথক পৃথক শক্তিতে দেবত্ব আরোপিত হইল। তখন ইন্দ্র, বরুণ, পবন, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি অসংখ্য বৈদিক দেবগণ এক একটী স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে পূজিত হইতে লাগিল। ঋগ্বেদসংহিতায় আদিদেবগণ জড় জগতের প্রাকৃতিক পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু পরোবর্ত্তী মন্ত্র সকলে আবার ঐ সকল দেবতার দেবত্ব সেই সেই পদার্থের অধিষ্ঠাত্রী শক্তির প্রতি আরোপিত হইয়াছে। জড়ময় অগ্নিই ঋগ্বেদের প্রথম দেবতা, কিন্তু উত্তরকালে জড়কে পরিত্যাগ করিয়া তাহার অন্তরালবর্ত্তিনী শক্তিতে অগ্নির দেবত্ব নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

কালসহকারে আর্য্যগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই সকল দেবতা কখন অনুকূল, কখন প্রতিকূল। কখন কালে বৃষ্টি হইয়া শস্যাদি জন্মায়, আবার কখন অতি-বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি হইয়া শস্যসকল বিনষ্ট হয়। তখন ঐসকল দেবতাকে সন্তুষ্ট করা, তাহাদের অত্যাচার ও প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িল সেজন্য নানাপ্রকার যাগ, যজ্ঞ, পূজা, হোম, বলিদান প্রভৃতি অনুষ্ঠানের পদ্ধতি সকল রচিত হইতে লাগিল। পরিশেষে বেদ-সকলের মন্ত্র, সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ রচিত হইয়া একটী সুবিস্তীর্ণ ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে পরিণত হইল।

এইরূপে যুগ যুগান্ত চলিয়া গেল, আর্য্যগণ ক্রমেই অবিদ্যার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং গভীর চিন্তা ও গবেষণায় নিমগ্ন হইয়া জীবতত্ত্ব ও ঈশ্বর-তত্ত্বান্বেষণে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে ক্রমে ভারতে উপনিষদের যুগ আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন আর্য্য মহর্ষিগণ বুঝিতে পারিলেন যে, যে অসংখ্য শক্তির দ্বারা এই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে, তাহা পৃথক পৃথক দেবতার পৃথক পৃথক শক্তি নহে, তাহা একই কেন্দ্র স্থান হইতে সমুদ্ভূত হইয়া সমস্ত বিশ্ব মণ্ডলে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যে শক্তি হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে ও যাহা হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, তাহার আধার একই। এই ভাবটী যেই হৃদয়ঙ্গম হইল, অমনি তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন যে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাস্ব তদ্ব্রহ্ম।" ক্রমে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে আরও অগ্রসর হইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, এই আদ্যাশক্তি বা ব্রহ্ম-শক্তি কেবল জড়শক্তিনিচয়ের নিদানভূতা নহেন, তাঁহাতেই সমস্ত জ্ঞান, চৈতন্য, আনন্দ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ; ও প্রাণীবৃন্দের প্রাণও তাঁহাতেই অধিষ্ঠিত আছে। তিনি অনন্ত, অপরিবর্ত্তনীয় ও এক। এই সত্য হৃদয়ঙ্গম হওয়া মাত্র আর্য্যগণ বলিয়া উঠিলেন যে——

"বেদাহ মেতং পুরুষং মহান্ত
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যু মেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়।

এক্ষণে বহু সহস্র শতাব্দী পরে ইউরো-পীয় পণ্ডিতগণ যে তত্ত্ব লাভ করিতে কতই যত্ন করিতেছেন, এবং যাহার অল্প-ভাস পাইয়া যাহাকে জড়শক্তি, কেহ বা অজ্ঞেয় শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ কত যুগ পূর্ব্বে সেই মহান্ তত্ত্ব লাভ করিয়া অতি দার্ঢ্য সহকারে বলিয়া গিয়াছেন যে "বেদাহ মেতং" আমি নিশ্চয় রূপে জানিয়াছি। হায়! আমাদের কি দুরদৃষ্ট যে, আমরা তাঁহাদেরই বংশ-সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দি ; অথচ তাঁহাদের সঞ্চিত রত্নকে পদ দ্বারা দলিত করিতে লজ্জিত হই না।

এই রূপে আর্য্যসমাজে ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণীত হইল বটে ; কিন্তু তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত হইল না। কতিপয় চিন্তাশীল পণ্ডিতমণ্ডলী ব্যতীত জন সাধারণে এই মত গ্রহণ করিল না। এক্ষণকার ন্যায় প্রচার করিবার জন্য যে কোন চেষ্টা হইয়াছিল, তাহাও বোধ হয় না। বর্ত্তমান সময়ে

যেরূপ দেশ সাধারণে শিক্ষাপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে সময়ে সেরূপ সাধারণ শিক্ষার নিয়মও কিছু ছিল না। সুতরাং শিক্ষা ও প্রচারের অভাবে এই ধর্ম্ম মত যে অপ্রচারিত থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আপামর সাধারণ লোক পূর্ব্বের ন্যায় জড় পূজক ও কুসংস্কারাবিষ্ট থাকিয়া গেল। এই ভাবে বহু কাল কাটিয়া গেল, ভারত ধর্ম্ম শূন্য হইয়া পড়িল এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের অভাবে কতিপয় যাগ, হোম, বলিদান প্রভৃতি বাহ্যানুষ্ঠানই তাহার স্থান অধিকার করিয়া ফেলিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে উপনিষদের যুগের অন্তর্ধান এবং পৌরাণিক যুগের অভ্যুদয় হইল।

খ্রীষ্ট জন্মিবার ছয় শতাব্দী পূর্ব্বে রাজকুমার সিদ্ধার্থ বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি দেখিলেন যে, এত যাগ যজ্ঞ করিয়াও মানুষ শান্তি পাইতেছে না। ইহার কারণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া রাজপুত্র গৃহসংসার সকলই পরিত্যাগ করিলেন এবং সাংসারিক সুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া কঠোর তপস্যা-ব্রত গ্রহণ করিলেন। ভগবৎস্বেচ্ছায় কালক্রমে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। প্রচলিত ধর্ম্মের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া তিনি বাসনানিবৃত্তিকেই পরমধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। ক্রমে তাঁহার ধর্ম্ম দিগদিগন্ত ব্যাপী হইয়া উঠিল এবং তাহার প্রবল তরঙ্গে বৈদিক ধর্ম্ম যায় যায় হইয়া পড়িল। তখন ব্রাহ্মণাচার্য্যগণ অনন্যোপায় হইয়া জনসাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য অভিনব তত্ত্ব সকল উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। অমনি অসংখ্য পুরাণ ও উপপুরাণ সকল রচিত হইয়া দেশময় ব্যাপিয়া পড়িল। ব্রাহ্মণেরা এই সকল পুরাণের দ্বারা এখন এইমত প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন যে, ঈশ্বর বাক্যমনের অগোচর, নিরাকার ও নির্ব্বিকার হইলেও সাধকের সাধনাসিদ্ধির জন্য সময়ে সময়ে মূর্ত্তি বিশেষ পরিগ্রহ করত জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; সুতরাং এই সকল মূর্ত্তি পূজা করিলেই ঈশ্বরের পূজা করা হইল; এবং তাহাতেই মানুষ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে।

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যা শরীরিণঃ
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা।"
যমদগ্নি।

চিন্ময়, অদ্বিতীয়, অংশরহিত এবং অশরীরী হইলেও সাধকের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হইয়া থাকে। নিরাকার-বাদীগণ এই শ্লোকের 'কল্পনা' শব্দের অবস্তুতে বস্তুত্ব আরোপ করা অর্থ করিয়া সাধক কর্ত্তৃক ঈশ্বরের রূপ স্বকপোলকল্পিত হয়, এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু সাকার-বাদিগণ 'কল্পনা' অর্থে 'পরিগ্রহ' ধরিয়া সাধকের সাধন সৌকর্য্যার্থে ঈশ্বর কর্ত্তৃক সাকাররূপ গৃহীত হইয়া থাকে, এই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এবং এই মূল সূত্র ধরিয়া অবতারবাদ ও ঈশ্বরবিগ্রহের নিত্যসিদ্ধতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। যাহা হউক, এইমত সংস্থাপিত করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং ঘোরতর সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া পরিশেষে বৌদ্ধদিগকে এদেশ হইতে উন্মূলিত করিতে সক্ষম হইলেন। সেই সময় হইতে নানাপ্রকার উপাসনাপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত ও গৃহীত হইতে লাগিল। ঈশ্বরের এক একটী শক্তিকে এক একটী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, অথবা ক্ষমতাশালী ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বিশেষে ঐশীশক্তি ও ঐশী গুণ

আরোপ করিয়া নানাপ্রকার রূপকালঙ্কার ও অত্যুক্তিতে পূর্ণ করত দেবোপাখ্যান সকল রচিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব, এই পাঁচটী প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়া আর্য্যগণ বহুবিধ উপধর্ম্মাবলম্বী হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে ষষ্টিমাখাল প্রভৃতিও দেবাখ্যা প্রাপ্ত হইয়া তেত্রিশ কোটী দেবতার দুর্ভেদ্য দুর্গ সংগঠিত হইয়া উঠিল। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দরিদ্র ব্যক্তি যেমন সাংসারিক অভাব মোচন ও সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্বর্দ্ধন জন্য প্রথমে অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয় ও পরে যেমন সে, সে উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া, অর্থকেই সার বস্তু জ্ঞানে রাশি রাশি সঞ্চয় করিয়া স্তূপাকৃতি করিতে থাকে; তদ্রূপ আর্য্যব্রাহ্মণগণ মূর্ত্তিপূজাকে পরমার্থসাধনের সহজ উপায় বলিয়া জনসাধারণে প্রবর্ত্তন করিয়া পরিশেষে তাহাকেই সারবস্তু করিয়া প্রকৃত পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন!

এই পাঁচটী উপাসক সম্প্রদায়মধ্যে বঙ্গদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব মতই প্রধানতঃ গৃহীত হইয়াছিল। এই যুগের শাক্তগণ আর উপনিষদের সময়ের শক্তিপূজকদিগের ন্যায় জড়প্রকৃতির অন্তরালে সেই আদ্যাশক্তিকে দেখিতে পাইতেন না, তাঁহাদের উপাস্য আর অসীম আকাশে ও মানবের অন্তরাত্মায় তেজোময় অমৃতময় রূপে প্রকাশিত হয়েন না, তাঁহাদের ভগবতী এখন মৃণ্ময়ী বা পাষাণময়ী জড়মূর্ত্তিতে পরিণতা। তাঁহারা একণে শাস্ত্র সকলের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হইয়া, দেবাসুরের যুদ্ধ ও মধুকৈটভবধকুবীরমধ্যোপাখ্যান সকল প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কাহার সাধ্য যে সে সকলের অবান্তর ব্যাখ্যা করে? সেই হইতে অবতারবাদের ও মূর্ত্তি পূজার ভাব দৃঢ়তর কুসংস্কাররূপে ভারতবাসীর হৃদয়ে বিরাজ করিতে লাগিল।

শক্তি মন্ত্র সাধন ও তাহাতে সিদ্ধি লাভের জন্য এই সময়ে আবার নানাপ্রকার তন্ত্র শাস্ত্র সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই সকল তন্ত্র কাহা কর্ত্তৃক কোন্ সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক করিয়া জানিবার উপায় নাই। কারণ অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় এই সকল শাস্ত্রে গ্রন্থকারের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল তন্ত্রই শিববাক্য বলিয়া বর্ণিত আছে, তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে, এই সকল তন্ত্র অতি আধুনিক। শিববাক্য বলিলে সকলের আশু বিশ্বাস ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিবেন বলিয়া, গ্রন্থকারগণ স্বস্ব নাম অপ্রকাশিত রাখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। এই সকল তন্ত্র যে কেবল একজনের লেখনীসম্ভূত, ইহা অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নহে। নানা সময়ে নানা ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে, ইহাই ঠিক যুক্তি।

তন্ত্র সকলের অভ্যুদয় কাল হইতেই শাক্তসম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। এক দল পূজা, হোম, বলিদান করিয়াই ক্ষান্ত; অপর দল সুরা ও গণিকা পর্য্যন্ত লইয়া সাধন আরম্ভ করিয়া ধর্ম্ম ব্যভিচারের চরমদৃষ্টান্ত দেখাইলেন। প্রথমোক্তগণ পশ্বাচারী, অর্থাৎ তাঁহারা মদ্য ও গণিকা ব্যবহার করেন না বলিয়া পশু-প্রকৃতি, আর শেষোক্তগণ বীরাচারী বা বামাচারী বলিয়া আখ্যাত হইলেন। অধিকাংশ তন্ত্রই বীরাচার মত সমর্থন করি-

য়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকার অর্থাৎ মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা ও মৈথুনের পাঁচটী উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক অর্থ আছে। যাহাই থাকুক না কেন, তান্ত্রিক সাধকদিগকে দেখিলে, সে কথা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গ দেশে তান্ত্রিক ধর্ম্মই যে প্রবল ছিল এবং শাক্তগণ বৈষ্ণবদিগের উপর যে বিবিধ অত্যাচার করিত, বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

"ভবানী পূজার সব সামগ্রী লইয়া
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপিয়া,
কলার পাত উপরে থুইল ওড় ফুল,
হরিদ্রা, সিন্দুর, রক্ত চন্দন, তণ্ডুল।
মদ্য ভাণ্ড পাশে রাখি নিজ ঘরে গেল।"

চৈঃ চঃ

শাক্তগণ যেমন ঈশ্বরের রুদ্রভাব ও ধ্বংশকারিণী শক্তিকে অবলম্বন করত আপনাদের উপাস্যদেবতার গঠনকল্পনা করিলেন, স্বত্ব গুণাবলম্বী বৈষ্ণবগণ সেই রূপ তাঁহার পালনী ও স্থিতিকারিণী শক্তি লইয়া বিষ্ণু পূজার মত প্রচার করিলেন। কাল সহকারে এই মত সর্ব্বত্র আদৃত হইতে লাগিল, এবং সাত্বিক ভাবের লোক সকল ইহাতে যোগদান করিলেন। তখন ভক্তি-প্রবণশাস্ত্র সকল বিরচিত হইয়া জন সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতে লাগিল। বিষ্ণু পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা, হরিবংশ প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র এই যুগের ধর্ম্মান্দোলনের ফল। ক্রমে বিষ্ণুর দশাবতার ও মর্ত্ত্য-লীলা সকল ব্যাখ্যাত হইল এবং বিষ্ণু ও তাঁহার অবতার শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি, মনোমোহনকারী পরম সুন্দর দেবাকারে পরিণত হইলেন। বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে বৈষ্ণবগণও অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যদেশে বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজ, বিষ্ণু-স্বামী, মধ্বাচার্য্য ও নিম্বাদিত্য, সম্প্রদায় সকল সংস্থাপন পূর্ব্বক বৈষ্ণব ধর্ম্মকে নিয়ম-বদ্ধ আকারে পরিণত করিলেন। বোধ হয় ব্যভিচারী শাক্তদিগের অত্যাচার হইতে জনগণকে রক্ষার জন্য সম্প্রদায়প্রণালী প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।

"পর মত খিঙ্গাংশে ছেদন করিয়া
স্বমত যাথার্থ্যস্থাপে বিচার করিয়া।"

ভক্তমাল।

চারিটী সম্প্রদায়ের নাম শ্রী, চতুর্ম্মুখ, রুদ্র ও চতুঃসন। শ্রীসম্প্রদায়ের আদিগুরু রামানুজস্বামী, চতুর্ম্মুখ সম্প্রদায় মধ্বাচার্য্যের স্থাপিত, বিষ্ণু স্বামী রুদ্রসম্প্রদায়, এবং নিম্বাদিত্য চতুঃসন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। ইঁহারা সকলেই বিষ্ণূপাসক ছিলেন; কিন্তু পরস্পরে বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। রামানুজ সম্প্রদায় রামের এবং মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ী কৃষ্ণের প্রাধান্য মানিয়া থাকেন। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ই শুদ্ধাচার, অহিংসা, ভক্তি প্রভৃতি সাত্বিক ধর্ম্ম সকল শিক্ষা দেন। সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব সকলেই গৃহত্যাগী উদাসীন। তাঁহারা একটী একটী দল বাঁধিয়া গুরুর অধীনে বাস করিতেন, এবং দেশপর্য্যটনে অধিক সময় ক্ষেপণ করিতেন। ইহারা যে যে স্থানে থাকিতেন, তাহাকে মঠ বলে। এক্ষণেও রামাৎ নিমাৎ প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব আছেন, কিন্তু প্রথমকালের ন্যায় তাঁহাদের ধর্ম্মের আর আধ্যাত্মিক ভাব নাই। নানাপ্রকার কদাচার ও কদনুষ্ঠান ইহা-

দের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সম্প্রদায় ধর্ম্ম এক সময়ে এরূপ প্রবল হয় যে, সম্প্রদায়বিহীন হইলে বৈষ্ণব ধর্ম্মই গ্রহণ করা হয় না. এই বিশ্বাস বৈষ্ণব জগতে বদ্ধমূল হইয়াছিল। বোধ হয় এই বিশ্বাস হেতু চৈতন্য দেবকেও সন্ন্যাস গ্রহণ সময়ে মধ্বাচার্য্য মঠের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

"বিনা সম্প্রদায় গুরু উপদেশ ব্যর্থ ;
কৃষ্ণ ভক্তি দূরে রহু না যায় অনর্থ।"
ভক্তমাল।

সম্প্রদায় ধর্ম্মের মধ্য দিয়াই প্রথমত ভক্তি ও প্রেমের ধর্ম্মের উদয় হয়। মাধবেন্দ্র পুরী, যামুনাচার্য্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ পরম ভক্ত ও প্রেমিক ছিলেন। তাঁহাদের জীবনে যে নদীর প্রথম প্রস্রবণ উন্মুক্ত হয় এবং যাহা পূর্ব্ব বাহিনী হইয়া মৃদু মন্দগতিতে বহিতে বহিতে শ্রীবাস, অদ্বৈত ও হরিদাস প্রভৃতির হৃদয় ক্ষেত্র অভিষিক্ত করে, সাগর সদৃশ চৈতন্য হৃদয়ের বিপুল ফোয়ারা খুলিয়া গিয়া তাহারই কলেবর বৃদ্ধি করত এক মহাপ্লাবন উপস্থিত করিয়াছিল। সম্প্রদায়ীগণের ঈশ্বর বিশ্বাস কি রূপ উজ্জল ছিল, তাহা যামুনাচার্য্য কৃত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী পাঠ করিলে জানা যাইতে পারে।

"উল্লংঘিত ত্রিবিধ সীম সমাতিশায়ি
সম্ভাবনং তব পরি ব্রঢ়িম স্বভাবং
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্য মানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশংত্বদনন্য ভাবাঃ।"
অলকমন্দার স্তোত্র।

হে ভগবান্! আপনার গোপনীয় চরিত্র স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সীমার পরাকাষ্ঠা অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে এবং আপনি ও মায়াবলে তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন ; কেবল আপনাতে অনন্য ভাব ভক্তেরাই তাহা দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন।

পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত পাঠে ইহা বুঝিতে হইবে না যে, সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ কর্তৃক বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রথম স্থাপিত হয়। বিষ্ণু পূজার পদ্ধতি পূর্ব্ব হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সম্প্রদায়ীগণ কেবল তাহারই মত সকল লইয়া এক একটী পৃথক দল গঠন করেন ; এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম ভাব কালক্রমে বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়ে। সম্প্রদায় বৈষ্ণবগণের পূর্ব্বে এদেশে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব গোস্বামী কর্তৃক বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল। তবে সম্প্রদায়ীগণের ভাবের সহিত ঐ ভাব মিশিয়া গিয়া একটী অভিনব আকার ধারণ করে। চৈতন্য জন্মিবার পূর্ব্বে, অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরিদাস প্রভৃতি বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ এই অভিনব ভাব লইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম যাজন করিতেছিলেন। মধ্বাচার্য্য মঠের অধস্তন সপ্তম আচার্য্য মাধবেন্দ্র পুরী দেশ পর্য্যটন উপলক্ষে এদেশে আগমন করত অদ্বৈতকে ভক্তির ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া যান ; তদবধি প্রেমভক্তির জলন্ত ভাব সকল অদ্বৈতান্তঃকরণে উদ্দীপিত হইতেছিল।

"তাঁর ঠাঁই উপদেশ করিলা গ্রহণ,
হেনমতে মাধবেন্দ্র অদ্বৈত মিলন।"
চৈঃ ভাঃ।

তৎকালে অদ্বৈতভবনেই বৈষ্ণবগণ সম্মিলিত হইতেন। অদ্বৈতাচার্য্যের টোল ছিল ; সেখানে অধ্যাপনা উপলক্ষে তিনি ভক্তি শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। যবন কুলোদ্ভব ভক্ত হরিদাস যবন কর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া তাঁহারই বাটীতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। তৎকালে বঙ্গসমাজ যে বৈষ্ণব

ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলনা, তাহাতে সন্দেহ নাই। চতুর্দ্দিকে ভক্তি ও বিশ্বাসশূন্য লোক গুল, ধর্ম্মের নামে কেবল কতকগুলি বাহ্যাড়ম্বরে মত্ত হইয়া পরিত্রাণের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে, ইহা দেখিয়া অদ্বৈত বড়ই ব্যাকুল হইতেন এবং কবে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া পাষণ্ডীউদ্ধার করিবেন, সেই চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিতেন।

"বিষ্ণু ভক্তি শূন্য দেখি সকল সংসার,
অদ্বৈত আচার্য্য দুঃখ ভাবেন অপার।"
চৈঃ ভাঃ।"

"কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ,
ভক্তি গন্ধ নাহি যাতে যায় ভব রোগ।
লোক গতি দেখি আচার্য্য করুণ হৃদয়।
বিচার করেন লোকের কৈছে গতি হয়?"
চৈঃ চঃ।

কথিত আছে যে, প্রেম ভক্তির বিশুদ্ধ ধর্ম্ম অবতীর্ণ করাইবার জন্য তিনি সেই হইতে বিশেষ সাধনা আরম্ভ করিলেন ও আপনিও প্রাণপণ যত্নে ভক্তি শাস্ত্র অধ্যাপনা ও নাম সংকীর্ত্তন প্রচার প্রভৃতি উপায় সকল অবলম্বন করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবেরা বলেন যে, তাঁহারই সাধনার বলে পরোবর্ত্তী সময়ে স্বয়ং ভগবান্ চৈতন্য দেহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

"এই মতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার।"
চৈঃ চঃ।

ক্ষুদ্র বৈষ্ণবমণ্ডলীর প্রতি তখন সর্ব্বদাই উৎপীড়ন ও অত্যাচার হইত; এবং ইতর ভদ্র সকলেই বৈষ্ণবদিগকে উপহাস করিত। চৈতন্যভাগবতকার তখনকার ভাব অতি সুন্দর রূপে দেখাইয়া গিয়াছেন।

"হাততালি দিয়া যে সকল ভক্তগণ
আপনা আপনি মেলি করেন কীর্ত্তন;
তাহাতেও উপহাস করয়ে সবায়ে,
'ইহারা কি কার্য্যে ডাক ছাড়ে উচ্চৈঃস্বরে?
আমি ব্রহ্ম আমাতেই বৈসে নারায়ণ:
দাস প্রভু ভেদ বা করয়ে কি কারণ?
সংসারী লোকেরে বলে বাধিয়া খাইতে;
ডাকিয়া বলয়ে হরি লোকে জানাইতে।
এ গুলার ঘর দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া।'
এই যুক্তি করে সব নদীয়া মেলিয়া।"
চৈঃ ভাঃ।

বৌদ্ধধর্ম্মের গতিরোধ জন্য যতগুলি আধ্যাত্মিক বল নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সর্ব্বাপেক্ষা শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদই প্রধান। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে বা সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে জন্মগ্রহণ করিয়া অল্পকাল মধ্যেই শঙ্কর অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন হইয়া উঠিলেন এবং অল্প বয়সে নানাশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার মত এই যে, ঈশ্বর ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই; জীবের অস্তিত্ব কেবল মায়ামাত্র; মায়াত্যাগ হইলেই জীব ও ব্রহ্মে কিছুই প্রভেদ থাকেনা। এইভাবে তিনি সমস্ত বেদান্তের ভাষ্য রচনা করিলেন। এখনও ঐ সকল শাঙ্করভাষ্য বেদবাক্যের ন্যায় মান্য হইয়া আসিতেছে। বোধ হয়, শিক্ষিত ও জ্ঞানীব্যক্তিদিগকে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করার জন্য এই মত উদ্ভাবিত হইয়াছিল। বাস্তবিকও তাহাই ঘটিয়াছিল। তৎকালের পণ্ডিত সমাজে এইমত সম্মানিত হওয়ার পর, বৌদ্ধগণ পরাজিত হইয়া সমুদ্র পারে ও হিমালয়পারে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চৈতন্যের পূর্ব্বে এইমত বহুল প্রচার হইয়াছিল। এইমতের বিরুদ্ধে তাঁহাকে তুমুল সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে মত তৎ-

লম্বন করিয়া শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বিধর্ম্মী বৌদ্ধদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তী ধর্ম্মসংস্কারক শাস্ত্রের দোহাই দিয়া আবার তাহারই মূলোৎপাটনে কৃতসংকল্প হইলেন। বৈষ্ণব সমাজে এই মত জন্যই ... অবধারিত হইয়াছে যে, ... শঙ্করের নাম শুনিয়া ... করেন। চৈতন্য "সোহহং" ... মতের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি ও তর্ক দেখাইয়া ... কাশীবাসী পরমহংস ও সন্ন্যাসী ... নিরুত্তর করিয়াছিলেন। তিনি উপনিষদ ও বেদসূত্রকে তত্ত্বজ্ঞানের আকর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; কেবল শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যাই দূষণীয় মনে করিতেন। কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি শঙ্করকে তিরস্কার করেন নাই, বরং বলিতেন যে, তিনি ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া বৌদ্ধদিগকে পরাজয় করাইবার জন্য এই অর্থ করিয়াছিলেন।

"উপনিষদ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব;
মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ পরমমহত্ত্ব।
গৌণবৃত্ত্যে যেই ভাষ্য করিল আচার্য্য
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সব কার্য্য।
তাঁহার নাহিক দোষ ঈশ্বরাজ্ঞা পাঞা,
গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া।"

চৈঃ চঃ।

কালে শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদ মধ্যে আবার নানাপ্রকার কুসংস্কার প্রবেশ করিতে লাগিল; তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ তাঁহাকে শিবের অবতার বলিয়া কল্পনা করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম শৈবধর্ম্মরূপে পরিণত হইল।

বৈষ্ণবগণ শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন ও তাহা তখনকার শিক্ষিত দলে কিরূপ সংক্রামিত হইয়াছিল, তাহা পশ্চাল্লিখিত উদ্ধৃত অংশ পাঠে জানা যাইতে পারে।

"সন্ন্যাসীর সনে না করেন আলাপন;
সেই আপনাকে মাত্র বলে নারায়ণ।
* * *
জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, বিরক্ত খ্যাতি যার;
কারও মুখে নাহি দাস্যমহিমা প্রচার।"

চৈঃ ভাঃ।

"ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস;
হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস?
মায়াধীশ, মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ;
হেন জীব ঈশ্বর সহ কহত অভেদ?"

এইতো গেল সম্ভ্রান্ত লোক ও শিক্ষিত পণ্ডিতদিগের কথা। ইতর সাধারণ লোকে, না শাক্ত, না বৈষ্ণব, না অদ্বৈতবাদী; ইহারা কিছুই ছিলনা। তাহারা সকল মতেরই সকল কথা মানিত কিম্বা না মানিত। যখন যে সম্প্রদায়ের লোকের দ্বারা পরিচালিত হইত, তখনই সেইরূপ চলিত। ইহারা বৈষ্ণবধর্ম্মও মানিত, মাংসমদ্য প্রভৃতি তান্ত্রিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠানেও যোগ দিত, আবার মায়াময় জগৎ, ঈশ্বর ভিন্ন জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা দায়িত্ব নাই, ইহাও বলিত। তদ্ভিন্ন জনসাধারণে কতকগুলি স্বকপোলকল্পিতদেবত্যপূজার পদ্ধতি প্রবিষ্ট হইয়াছিল, ইহাতেই তাহাদের অধিক আমোদ ও কৌতুক দেখা যাইত। মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি, ষষ্ঠ প্রভৃতি কতকগুলি দেবতার পর্ব্বেই তাহাদের বিশেষ উৎসাহ ছিল। এক্ষণকার ন্যায় দুর্গোৎসবের প্রথা তখনও প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহা বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

ফলত যেমন মহর্ষি ঈশার আগমনের পূর্ব্বে সংসারবিরাগী যোহন আসিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন যে, "আমার পরে যিনি আসিতেছেন তাঁহার দ্বারায় স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে" তদ্রূপ ভক্তশ্রেষ্ঠ চৈতন্যের প্রেম ভক্তির ধর্ম্ম আসিয়া যেন এই বলিয়া গেল যে "বঙ্গদেশ প্রস্তুত হও! ভক্তি বন্যার জলে অজ্ঞান অন্ধকারের আবর্জ্জনা সকল ধৌত কর, আমার পর যে আলোক এখানে আসিতেছে তাহা হইতেই স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে; অতএব সেই আলোক গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও।" ফলে যিনি যাহাই বলুন, আমরা চৈতন্যচন্দ্রের উদয়কে পরবর্ত্তী সত্যধর্ম্মবিকাশের প্রথম ঊষা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকি। ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন বঙ্গের আকাশ প্রান্তে তেজঃপুঞ্জ ধূমকেতুর ন্যায় উদিত হইয়া ৪৮ বৎসর কালযাবৎ প্রেমভক্তির আলোকে বঙ্গবাসীর হৃদয় আলোকিত করত পুনরায় অনন্তের বক্ষে অন্তর্দ্ধান হইয়া গিয়াছেন। এই ৪৮ বৎসর মধ্যে এ দেশের ধর্ম্ম জগতে যে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই পূর্ব্বাভাস আমরা এই অধ্যায়ে বর্ণন করিলাম।

## চৈতন্যের সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘটনা।

১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ ইংরাজী ১৪৮৫ অব্দে চৈতন্য দেব জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৪৫৫ শকে অর্থাৎ ১৫৩৩খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার অন্তর্দ্ধান হয়।

"চৌদ্দশতসাত শকে জন্মের প্রমাণ;
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্দ্ধান।"

চৈঃ চঃ।

এই অর্দ্ধশতাব্দীর ঐতিহাসিক ও সামাজিক বৃত্তান্ত আমরা এক্ষণে বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থাবলম্বনে প্রদর্শন করিতেছি।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতে হিন্দুরাজত্ব লোপ হইল; পৃথুরাজের অধিকৃত সিংহাসন যবনকরতলন্যস্ত হইল। সুলতান সাহাবুদ্দীন দিল্লীর সাম্রাজ্য হস্তগত করিয়া আপন সৈন্যাধ্যক্ষ কুতবুদ্দীনকে তাহার শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। কিছুদিন পরে সাহাবুদ্দীনের মৃত্যু হইলে গজনীর সাম্রাজ্য উৎসন্ন হইল। তখন কুতবুদ্দীন সম্রাট উপাধি গ্রহণ করত দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রধান সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিলিজী সেনবংশীয় বৃদ্ধ নরপতি লাক্ষণেয়কে কৌশল ক্রমে রাজ্য চ্যুত করিয়া বঙ্গদেশে যবন পতাকা উড্ডীন করিলেন, এবং দিল্লীশ্বরের নামে স্বয়ং ইহা শাসন করিতে লাগিলেন। গৌড়নগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। সেই হইতে প্রায় দেড়শত বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া ক্রমান্বয়ে মুসলমান সুবাদারগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইতে লাগিল। ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক এই দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইল। পূর্ব্বভাগে বাহাদুর খাঁ সুবাদার নিযুক্ত হইয়া সোণার গ্রাম নগরে আপন রাজধানী স্থাপন করিলেন। নাজীরুদ্দীন ইহার পূর্ব্ব হইতে সমস্ত বঙ্গের সুবাদার ছিলেন। বিভাগের পরও তিনি গৌড় নগরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কাল সহকারে দিল্লীর সম্রাটগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় তাঁহাদের অধীনস্থ সুবাদারগণ দিল্লী সাম্রাজ্যের অধীনতা পরিত্যাগ করত স্বাধীন হইতে লাগিলেন। ১৩৪০

খ্রীষ্টাব্দে লোদীবংশীয় সম্রাট মহম্মদ সাহার অধিকার সময়ে সোণার গ্রাম বিভাগের সুবাদারের জনৈক সামান্য ভৃত্য কৌশলক্রমে সমস্ত বঙ্গদেশ হস্তগত করত সুলতান সেকেন্দার নামে বঙ্গের একেশ্বর হইলেন; এবং দিল্লীশ্বরের অধীনতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া পরিচিত করিলেন। দিল্লীশ্বর তখন ক্ষমতাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং তিনি সেকেন্দরের কিছুই করিতে পারিলেন না। সেই হইতে সম্রাট আকবর সাহার অধিকার অর্থাৎ ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দুই শত বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশ দিল্লীর সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন ভাবে মুসলমানরাজগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইতে লাগিল। এক্ষণে পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন যে, পাঠান রাজগণের এইরূপ স্বাধীনতার কালেই নবদ্বীপে শচীনন্দন জন্মগ্রহণ করেন।

চৈতন্যচন্দ্রের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে বারিক নামে বঙ্গেশ্বরের জনৈক খোজা স্বীয় প্রভুকে হত্যা করিয়া সুলতান সাজাদানাম গ্রহণ করত গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ৮ মাস গত হইতে না হইতেই মুলুক আণ্ডিল নামক তাঁহার একজন সেনাপতি তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেরোজ সাহা উপাধি গ্রহণ করত বঙ্গ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। ফেরোজের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ সাহা একবৎসর রাজত্ব করিলে ১৪৯৫ সালে একজন আবিসিনীয় রাজপুরুষ তাঁহার জীবন নাশ করিয়া মজঃফর সাহা উপাধিগ্রহণ করত বঙ্গরাজ্য অধিকার করিলেন। এই ব্যক্তি অতিশয় নিষ্ঠুর ও ঘৃণিত স্বভাবের লোক ছিল। তাহার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অচিরকাল মধ্যে ওমরাগণ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন এবং মহম্মদীয় বংশজাত মন্ত্রী সৈয়দ হোসেনকে সেনাপতি করিয়া বঙ্গেশ্বরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। গৌড় নগরের প্রান্তরে এক মহাসমর হইল; তাহাতে মজঃফর সসৈন্যে নিহত হইলে, দ্বিতীয় আলাউদ্দীন নাম গ্রহণ করত সৈয়দ হোসেন বাঙ্গালার মসনদে উপবেশন করিলেন। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, এবং ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সৈয়দ হুসেন রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং চৈতন্য জীবনের দ্বাদশ হইতে পঞ্চত্রিংশৎবর্ষ পর্য্যন্তের ঘটনা তাঁহারই রাজত্বকালে সংঘটিত হইয়াছিল। এই রাজার রাজত্ব সময়ে রাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল; প্রজাগণ নিরুদ্বেগে কাল যাপন করিতে লাগিল এবং অনেক সুনিয়মও সংস্থাপিত হইল। ইনি এক ডালার দুর্গ সংস্কার করিয়া সেখানে আপন বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং রাজ্যের অহিতকারী আবিসিনীয় ও অন্যান্য দুষ্ট লোকদিগকে দমন করিলেন। ইঁহার পুত্র নসরৎ সাহা ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার অধিকার সময়ে গৌড় নগরে অনেক সুন্দর সুন্দর সৌধমালা নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে বৎসরে চৈতন্যের তিরোধান হয়, ইনিও সেই বৎসরে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

গৌড়েশ্বর সৈয়েদহুসেনের নাম চৈতন্য ভাগবতে উল্লিখিত আছে। দ্বিতীয় আলাউদ্দীনের পূর্ব্বনাম সৈয়দহুসেন ছিল ও সে সময়ে তিনিই বঙ্গের অধীশ্বর ছিলেন।

সুতরাং চৈতন্যভাগবতের সৈয়দহুসেনই যে দ্বিতীয় আলাউদ্দীন, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। যখন রাজধানীর সমীপবর্ত্তী রামকেলী গ্রামে চৈতন্য হরিনামের মহিমা প্রচার করিতেছিলেন, কোটি কোটি নরনারী তাঁহাকে দেখিতে ও নামসঙ্কীর্ত্তন শুনিতে আসিতেছিল, মৃদঙ্গ করতালের নিনাদে দিগন্ত কম্পিত হইতেছিল এবং প্রেমভক্তির বন্যাতে সমস্ত বঙ্গভূমি ভাসিতেছিল, গৌড়ের সহর কোতোয়াল রাজাকে সেই বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন।

"কোতয়াল গিয়া কহিলেক রাজস্থানে
একাসন্যাসী আসিয়াছে রামকেলী গ্রামে।
নিরবধি করয়ে ভূতের সঙ্কীর্ত্তন।
না জানি তাঁহার স্থানে মিলে কত জন।"

চৈঃ চঃ।

এই সম্বাদ পাইয়া সৈয়দহুসেন হিন্দু সভাসদ্‌গণকে বিশেষবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎকালে কেশবছত্রী ও রূপ এবং সাকর মল্লিক এই তিন জন সর্ব্বপ্রধান হিন্দু সভাসদ্ ছিলেন। রূপ ও সাকর মল্লিককে বীরখাস ও দবীর খাস বলিত। চৈতন্যের প্রেমমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ও মহোচ্চপদমর্য্যাদাকে তৃণবৎ পরিত্যাগ করত পরবর্ত্তী বৈরাগ্যাশ্রমে ইঁহারাই রূপ সনাতন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহারা এই বলিয়া চৈতন্যের বিষয় উড়াইয়া দিলেন যে "কোথা হইতে একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আসিয়াছে তাহার এত মহত্ত্ব কি যে আপনি তাহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন।" তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, যবন জাতি ঘোর অবিশ্বাসী, এক্ষণে যদিও সাধুভাব প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু পরে অন্যের মন্ত্রণা শুনিয়া বিপদ ঘটাইতে পারে। এই বিবেচনায় চৈতন্যকে রাজধানীর নিকট হইতে চলিয়া যাইবার জন্ত অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ভগবানের নামের কি মহিমা ও সাধুগণের প্রকৃতি কি মনোহর! হোসেন সাহা চৈতন্যের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করা দূরে থাকুক, তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা জন্য ও গোঁড়া কাজীগণ তাঁহার প্রতি অন্যায়াচরণ করিতে না পারে, তজ্জন্য রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন।

"রাজা বলে এই মুই বলি যে সবারে;
কেহ যদি উপদ্রব করয়ে তাঁহারে।
যেখানে তাঁহার ইচ্ছা থাকুন সেখানে;
আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে।
সর্ব্বলোক লই সুখে করুন কীর্ত্তন
বিরলে থাকুন কিম্বা যেবা লয় মন।
কাজীবা কোটাল কিম্বা অন্য কোন জন,
যে কিছু বলিবে তার লইব জীবন।"

চৈঃ ভাঃ।

ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, হোসেন সাহা একজন গোঁড়া মুসলমান ছিলেন; সুতরাং হিন্দুর প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। বৈষ্ণব গ্রন্থেও ইহার যথেষ্ট পোষকতা পাওয়া যায়।

"যে হোসেন সাহা পূর্ব্বে উড়ীষার দেশে
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে।"

চৈঃ ভাঃ।

"যদ্যপি যবন রাজা পরম দুর্ব্বার।"

চৈঃ ভাঃ।

তবে যে চৈতন্যের প্রতি তিনি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা ভগবানের ইচ্ছায় বলিতে হইবে।

এই সময়ে রূপ ও সাকর মল্লিক, দুই ভ্রাতা চৈতন্যচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করি-

তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় হইয়া লণ্ডন পরিত্যাগ করিলাম। বিপুল তরঙ্গ পূর্ণ "চানেল" পার হইয়া ফরাসীস্ রাজ্য পঁহুছিলাম। আমরা অমরাবতী সদৃশ পারিশ ভুলিতে পারি নাই। মনে করিয়াছিলাম। ত্রছেলস্ হইয়া পারিশ যাইব কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। একেবারে বরাবর পারিশ পঁহুছিলাম। তথায় ৫ দিবস থাকিয়া ইতালীর প্রধান প্রধান সহর দেখিতে যাত্রা করিলাম।

# তুকারাম ও রামপ্রসাদ।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, আপামর সাধারণকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য ও তাহাদিগকে উন্নতির মঞ্চে উঠাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মবীরগণ আবির্ভূত হয়েন। আবার ইহাও দেখা যায় যে, এই উন্নত-মনা ব্যক্তিগণ, আবশ্যক মত, ভিন্ন ভিন্ন দেশে বা প্রদেশে দেখা দিয়া থাকেন। অন্য দেশ হইতে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন নাই, ভারতবর্ষই আমাদের কথাগুলি সপ্রমাণ করিবে। বাঙ্গালায়, চৈতন্য ও রামপ্রসাদ; উত্তর পশ্চিম প্রদেশে তুলসীদাস ও কবীরদাস; রাজপুতানায়, রামচরণ ও রয়দাস; পঞ্জাবে, গুরু নানক ও গুরুগোবিন্দ; গুজরাটে,দাদু; দাক্ষিণাত্যে, জ্ঞানোবা ও তুকারাম এবং মান্দ্রাজে রামানুজ আবির্ভূত হইয়া সাধারণকে ধর্ম্মভাবে অনুরঞ্জিত করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে ভারতবাসীগণ জাতিত্ব নিগড়ে আবদ্ধ, তাহারাই মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় এই ধর্ম্মবীরগণের দৃষ্টান্ত দর্শনে ও উপদেশ শ্রবণে জাত্যাভিমানকে একেবারে বিদূরিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এবং ইহা আরো আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে যিনি এক সময়ে দাম্ভিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি যবন ও চণ্ডালের সহিত একত্রে বসিয়া ভোজন করিয়াছেন, আবার যিনি অতি নীচ কুলোদ্ভব, তিনি উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণকে দীক্ষা দিয়াছেন ও তাহাদের সহিত একত্রে আহার করিয়াছেন। মহাপণ্ডিত চৈতন্য মুসলমানদিগকে স্বদলভুক্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের সহিত একত্রে ভোজন করিয়াছেন, অথচ এই চৈতন্য সহস্র সহস্র লোকের নিকট হইতে ইষ্টদেবতার ন্যায় পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। রয়দাস, জাতিতে চর্ম্মকার ছিলেন। চিতোরের রাজমহিষী ইহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণ ইহার সহিত একত্রে ভোজন করিতেন। এরূপ নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও রয়দাস একজন সাধু বলিয়া পরিগণিত এবং একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের * প্রবর্ত্তক বলিয়া পূজিত। ফল কথা এই যে, যে বংশেই কেন জন্মগ্রহণ করুন না, প্রকৃত সাধু ব্যক্তিকে সকলেই পূজা করিয়া থাকেন। সাধু তুকারাম ও কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সম্বন্ধে কিছু বলা এই প্রস্তাবটীর উদ্দেশ্য। কিন্তু বঙ্গদেশে তুকারাম বিশেষরূপে পরিচিত নহেন। এই জন্য, প্রথমে, তাঁহার জীবনের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিব এবং তাহার পর, এই দুই সাধু ব্যক্তির মধ্যে কি

* এই সম্প্রদায়টী রয়দাসী বলিয়া পরিচিত এবং রয়দাসকে আপামর সাধারণে রুইদাস বলিয়া জানে।

কি সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা দেখাইতে চেষ্টা পাইব।

পুনা হইতে প্রায় আট ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে, দেহনামকগ্রামে, অনুমান ১৫০০ শকাব্দে, তুকারাম জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে শূদ্র ছিলেন। তাঁহার পিতা বণিকের ব্যবসা করিতেন। বার্দ্ধক্য দশা প্রাপ্ত হইলে, তুকারামের পিতা সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। সংসারের ভার তুকারামের উপর ন্যস্ত হইল। তুকারাম তাঁহার পিতার ব্যবসা কিছুকাল চালাইয়াছিলেন। তাঁহার দুইটী স্ত্রী ছিল। কিছুদিন পরে, তিনি একটী স্ত্রীকে হারাইলেন এবং তাঁহার একটী পুত্রও ইহলোক হইতে অবসৃত হইল। এই সময়ে আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তুকারাম তাঁহার ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। ইহাতে তিনি বিশেষরূপে মুহ্যমান হইলেন। ইহার উপর আবার তাঁহার স্ত্রীর বাক্য যন্ত্রণা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। তুকারামের মন ধর্ম্মপ্রবণ ছিল। তিনি কয়েকজন ভক্ত প্রতিবাসীকে লইয়া ভজন ও কীর্ত্তন করিতেন। সংসারের প্রতি আর বড় মন দিতেন না। নিজ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, দীন ব্যক্তিকে দেখিলে মুক্ত হস্তে দান করিতেন। তুকারামের স্ত্রী জিজা বাইয়ের এসকল সহ্য হইত না। স্বার্থপরতা তাঁহাকে এতদূর পর্য্যন্ত অন্ধ করিয়া তুলিয়াছিল যে, স্ত্রী-সুলভ লজ্জাকে তিনি জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। তুকারামের বন্ধুগণকে তিনি ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। "তাহাদের কি অন্য কোন কর্ম্ম নাই যে এখানে আসিয়া সময় অতিবাহিত করে? অথবা তাহারা অকর্ম্মণ্য হইবে, নতুবা কে এত মূর্খ যে এ প্রকারে সময় অপব্যয় করে" ইত্যাকার বাক্য তাঁহাদের উপর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তুকারাম কোন দীন ব্যক্তিকে কিছু দিতে গেলে, জিজা বাই তাঁহাকে বাধা দিতেন—এমন কি তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষার তণ্ডুল পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইতেন। তুকারাম বিরত হইয়া গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার বাটী হইতে কিছু দূরে, তাঁহার কোন পূর্ব্বপুরুষের স্থাপিত বিঠোবা * দেবের একটী মন্দির ছিল। তুকারাম এই মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। এখান হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে, ভাণ্ডারা নামক একটী পর্ব্বত আছে। তুকারাম মধ্যে মধ্যে তথায় গিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতেন এবং সন্ধ্যার সময়ে বিঠোবার মন্দিরে প্রত্যাগমন করত দেব সমক্ষে নৃত্য গীত করিয়া রজনী অতিবাহিত করিতেন।

তুকারাম যদিও সংসার ত্যাগ করিলেন, আত্মীয় স্বজনের স্নেহ তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে তিনি বাটী গমন করিতেন, আবার পরিজনগণের বিরুদ্ধ ভাব দেখিয়া চলিয়া আসিতেন। তুকারাম যখন বাটীতে থাকিতেন, অধমর্ণগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া দেনা পরিশোধ সম্বন্ধে তাহাদের সুবিধা করিয়া লইত। খাতকগণের নিকট হইতে সুদ লইতেন না, আবার তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া সুবিধা মত দেনা পরিশোধ করিতে অনুমতি দিতেন। তুকারামের কনিষ্ঠের ইহা প্রীতিকর হইল না। তিনি তুকারামের সহিত পৃথক্ হইবার প্রস্তাব করিলেন। বিষয়াদি বিভক্ত হইল। তুকারাম কতক গুলি দলিল দস্তাবেজ পাইলেন। তাঁহার আর ইচ্ছা হইল

* এ প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণ বিঠোবা নামে খ্যাত।

না যে, টাকা আদায়ের জন্য অধমর্ণগণের সহিত বিবাদ করেন। কাগজ পত্রাদি রাখিবার আবশ্যকতা বিবেচনা না করিয়া সমুদায় জলে নিক্ষেপ করিলেন। এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া জিজাবাই ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি তুকারামকে যৎ-পরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তুকারাম কিছু না বলিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। দেহু হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে আলন্দি নামক একটী স্থান আছে। এখানে জ্ঞানোবা নামক এক জন সাধুর একটী সমাধি আছে। এই স্থানের নিম্ন দিয়া ইন্দ্রিয়ানী নাম্নী একটী নদী প্রবা-হিত। তুকারাম হৃদয়ে শান্তি লাভ করি-বার জন্য এই মনোরম্য স্থানটীতে গমন করিলেন। তথায় ২। ৪ দিন যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তথাকার এক জন কৃষকের এক জন ক্ষেত্র রক্ষকের আবশ্যক হইয়াছিল। সে দেখিল, তুকারামের কোন কাজ নাই, বৃথায় কালক্ষেপ করিতেছে। তুকারামকে ক্ষেত্র রক্ষকের কার্য্যটী দিবার জন্য প্রস্তাব করিল। তুকারাম তাহাতে সম্মত হইলেন। অর্দ্ধ মণ শস্য এই কার্য্যের বেতন স্বরূপ স্থির হইল। তুকারাম ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া বিঠোবা দেবের নাম গান করেন। বিহঙ্গ কুল দলে দলে আসিয়া শস্য খাইতে লাগিল। তুকারাম তাহাদের নিবারণ করেন না। একদা ক্ষেত্রের স্বামী এই ব্যাপারটী নয়ন গোচর করিল। সে তুকারামের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। তুকা-রাম বলিলেন, একি আশ্চর্য্য কথা; পক্ষী-গণ ঈশ্বরের জীব; তাহারা কি আহারা-ভাবে মারা যাইবে? এই শস্যে তাহাদেরও মনুষ্যের ন্যায় অধিকার আছে। উভয়ে ক্ষণকাল বচসা হইল। অবশেষে স্থানীয় পঞ্চায়েতের উপর বিচারের ভার ন্যস্ত হইল। পঞ্চায়েত এই স্থির করিলেন যে, ক্ষেত্রে যত শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তুকারামকে সমু-দায় দিতে হইবে। তুকারাম অগত্যা এই মীমাংসায় সম্মতি প্রদান করিলেন। অন্যান্য বৎসরে, চল্লিস মণের অধিক শস্য এই ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয় না। কিন্তু, ভক্তের প্রতি ভগবানের কি অপার করুণা। এবার তাহাতে তাহার অষ্ট গুণ অধিক ফসল হইল। ক্ষেত্রস্বামী ইহা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতে লাগিল। কিন্তু, এ সম্বন্ধে কাহাকে কোন কথা বলিল না। ক্ষেত্রস্বামীর প্রতি-বাসীগণ তুকারামকে এক জন ধার্ম্মিক বলিয়া জানিত। পঞ্চায়েত তাঁহার সম্বন্ধে যে মীমাংসা করিয়াছিলেন, তাহাও তাহারা অবগত ছিল। ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইয়াছে, এই সংবাদ তাহারা পঞ্চা-য়েতকে জানাইল। পঞ্চায়েত পুনরায় বিচার করিয়া স্থির করিলেন যে, ক্ষেত্রের সমুদায় শস্য সংগৃহীত হইলে, তাহা হইতে ক্ষেত্রস্বামীকে চল্লিশ মণ প্রদান করিয়া অবশিষ্ট তুকারামকে দেওয়া হইবে। আল-ন্দির কয়েক জন ভদ্র লোকের উপর শস্য বিভাগের ভার অর্পিত হইল। তাহারা ক্ষেত্র-পালকে চল্লিশ মণ শস্য দিয়া অবশিষ্ট তুকা-রামের গৃহে পাঠাইয়া দিল।

তুকারাম বিঠোবার নাম লইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। কখন নিজ গ্রামস্থিত বিঠোবা দেবের সমক্ষে নূতন গীত করেন, কখন ভাণ্ডারা পর্ব্বতে অবস্থিত করিয়া ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন, কখন বা নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে হরিগুণ গান করিয়া

বেড়ান। এই সময়ে বাবা চৈতন্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বাবা চৈতন্ত, মহাপ্রভু চৈতন্তদেবের এক জন শিষ্য ছিলেন, সন্দেহ নাই। তিনি তুকারামকে নানা প্রকার উপদেশ দিলেন, ভগবানকে পাইবার প্রকৃষ্ট পথ অর্থাৎ ভক্তিমার্গ তাঁহাকে দেখাইলেন এবং নানা প্রকার মধুর বাক্যে তুকারামের মনে শান্তি প্রদান করিলেন।

তুকারাম এত দিন কেবল নিজ উন্নতির জন্ত ব্যগ্র ছিলেন। এখন একটা গুরু ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। সাধারণের নিকট হরিনাম গান করা তাঁহার একটা বিশেষ কার্য্য হইয়া উঠিল। চৈতন্যদেবের প্রভাব তাঁহাতে সংক্রামিত হইল। তিনি দ্বারে দ্বারে হরিনাম গান করিতে লাগিলেন। নামদেব নামে একজন সাধু এতদঞ্চলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কয়েকটা অভঙ্গ অভ্যাস করিয়া তুকারাম তাহা গাইয়া সাধারণকে শুনাইতে লাগিলেন। কথায় * এবং সঙ্কীর্ত্তনে এই সকল † অভঙ্গ, গীত হইতে লাগিল। নামদেবের অভঙ্গ গাইতে গাইতে তাঁহার নিজে রচনা শক্তি স্ফূর্ত্তি পাইল। ক্রমে তিনি উত্তম উত্তম অভঙ্গ রচনা করিতে লাগিলেন। এই সকল অভঙ্গতে তুকারাম বেদ ও পুরাণের উৎকৃষ্ট ভাব সকল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। অভ্যাস সহকারে উত্তম উত্তম অভঙ্গ সকল তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল বাহির হইতে লাগিল। তুকারামের ধর্ম্মভাব ব্যাখ্যা ও সংগীত শ্রবণে সাধারণে মোহিত হইয়া উঠিল। কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি বৃদ্ধ কি যুবা, কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়। তুকারাম যে এক জন শূদ্র,তাহা তাহারা ভুলিয়া গেল। তাঁহাকে ব্রাহ্মণোচিত সম্মান প্রদান করিতে লাগিল।

তুকারামের প্রতি এপ্রকার অযথা ভক্তি দেখান হইতেছে, ইহা কয়েক জন দাম্ভিক ব্রাহ্মণের সহ্য হইল না। তাহাদের অন্তঃকরণ ইর্ষানলে জ্বলিতে লাগিল। আপামর সাধারণকে নিবারণ করা তাহারা অসাধ্য বিবেচনা করিল। এরূপ ভক্তির উচ্ছ্বাসকে বাধা দেওয়া কাহার সাধ্য? সুতরাং ব্রাহ্মণগণ, তুকারামের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। দেহগ্রামে মামবোজি নামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি তুকারামের কথা ও ভজন সর্ব্বদাই শুনিতেন। তাঁহার সহিত তুকারামের সদ্ভাব ছিল। এমন কি, তিনি একজন ভক্ত বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন। কিন্তু মনের মধ্যে তিনি বিরূপ ভাব পোষণ করিতেন। মামবোজি একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ গোস্বামী ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে সম্মান প্রদান করিত। কিন্তু তুকারামের যশ প্রভাবে তাঁহার প্রভা লুকায়িত হইল। বিঠোবাদেবের মন্দিরের নিকট, গোস্বামী মহাশয়ের একটী উদ্যান ছিল। এই উদ্যানটীর চারিদিকে কাঁটার বেড়া দেওয়া

---

* কথার প্রণালী এই যে, কথক মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া প্রথমে একটী বচন আবৃত্তি করেন, পরে তাহা নানা প্রকার দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্রোতাগণকে বুঝাইয়া দেন। মধ্যে মধ্যে সংগীত হইয়া থাকে এবং ইহাতে কয়েকজন ব্যক্তি কথক মহাশয়ের সহিত যোগ দান করেন।

† অভঙ্গ—ধর্ম্মসংগীত। অভঙ্গের অর্থ যাহা ভঙ্গ নহে। অভঙ্গ গান অধিক বিস্তীর্ণ বলিয়া বোধ হয় ইহার নাম অভঙ্গ হইয়াছে। কোন কোন অভঙ্গ একশত চরণে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ছিল। কাঁটা-গাছ বাড়িয়া মন্দিরে যাইবার পথ রুদ্ধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। এতদঞ্চলে, একাদশী তিথিতে, দেবমন্দিরে একটী প্রকৃত উৎসব হয়। তথায় কথা ও ভজন হইয়া থাকে। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, সকলেই তথায় উপস্থিত হইয়া দেব দর্শনাদি করেন। একাদশী আগত-প্রায় দেখিয়া, তুকারাম যাত্রীগণের ক্লেশ নিবারণ জন্য, স্বহস্তে কাঁটা গাছের বর্দ্ধিত অংশ গুলি কাটিতে লাগিলেন। তুকারাম মামবোজিকে একজন ভক্ত বলিয়া জানিতেন। সুতরাং তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, একার্য্য তাঁহার প্রীতিকর হইবে। গোঁসাই ঠাকুরের পূর্ব্ব হইতেই তুকারামের প্রতি বিদ্বেষ ভাব ছিল। এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া, তিনি দ্রুতবেগে আগমন করিলেন, এবং একটী কাঁটা ডাল উঠাইয়া লইয়া তাহার দ্বারা তুকারামকে প্রহার করিলেন। তুকারামের অঙ্গ কাঁটায় ক্ষত বিক্ষত হইল। তিনি জ্বালায় অস্থির হইলেন। কিন্তু, মামবোজিকে কোন কথাই বলিলেন না। অসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত সমুদায় সহ্য করিলেন। ভক্তগণ তুকারামের শুশ্রূষা করিল। তিনি কিছু দিন পরে আরাম হইলেন। তুকারাম পূর্ব্বকার ন্যায় ভজন কীর্ত্তনাদি করিতে লাগিলেন। গোঁসাইজির প্রতি তাঁহার কোন বিরক্তির চিহ্ন কখন প্রকাশ পায় নাই।

ইহার পর, তুকারামের উপর আর একটী অত্যাচার আরম্ভ হইল। রামেশ্বর ভট্টনামে একজন ব্রাহ্মণ তুকারামের অনিষ্ট করিবার জন্য সন্নবান হইলেন। তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে জেলার বিচার-কর্ত্তার নিকট একটী অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। তিনি বিচারকর্ত্তাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তুকারাম শূদ্র হইয়া বেদ ব্যাখ্যা করিতেছে; ইহা হিন্দু ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। অতএব তাহাকে বিশেষ রূপে দণ্ড দেওয়া উচিত। বিচারকর্ত্তা আশঙ্কা করিলেন যে, প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং তুকারামকে দেহগ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিবার অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। তুকারাম ইহা অবগত হইয়া অতীব মুহ্যমান হইলেন। অনুজ্ঞা পত্র বাহির হইবার পূর্ব্বেই তিনি রামেশ্বর ভট্টের নিকট গমন করত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রামেশ্বর ভট্ট বলিলেন যে, যদ্যপি তিনি আর অভঙ্গ রচনা না করেন এবং যে সকল অভঙ্গের পুঁথি তাঁহার নিকটে আছে, তাহা জলে নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে বিচারালয়ের অনুজ্ঞা স্থগিত রাখা হইবে। তুকারাম এ সময়ে তাঁহার মানসিক বল হইতে বিচ্যুত হইলেন। রামেশ্বর ভট্টের কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন। তাঁহার অভঙ্গের পুঁথি গুলি জলে ভাসাইয়া দিলেন। কিন্তু জলে নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে পুঁথি গুলিকে উত্তম রূপে বাঁধিয়া দিয়া ছিলেন। তুকারামের এই কার্য্যটী দেখিয়া, সামান্য ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিল, দেখ এ লোকটী কি নির্ব্বোধ, কিছু দিন পূর্ব্বে সে তাহার দলিল আদি নষ্ট করিয়া, তাহার পার্থিব সুখের পথ রুদ্ধ করিয়াছিল, এখন আবার অভঙ্গের পুঁথি গুলি জলে নিক্ষেপ করত, তাহার স্বর্গ গমনের দ্বার বন্ধ করিল। এই কথা গুলি তুকারামের অন্তঃকরণে শেল সম বিদ্ধ হইল। তিনি তাঁহার মূর্খতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি বিঠোবা দেবের মন্দিরের সমক্ষে ধর্ণা

দিয়া রহিলেন। তাঁহার অন্যায় কার্য্যের জন্য দেবতার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং অভঙ্গগুলি পুনঃপ্রাপ্তির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। কথিত আছে যে, ত্রয়োদশ দিবসের রজনীতে, বিঠোবা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, অভঙ্গ গুলি নষ্ট হয় নাই, নদীর তীরে গমন করিলেই তিনি তাহা পাইবেন। তুকারাম বিঠোবা দেবের আজ্ঞা মত অভঙ্গের পুঁথি গুলি লইয়া আসিলেন। তুকারামের অন্তঃকরণে আর আনন্দ ধরিল না। তিনি বিঠোবা দেবকে ধন্যবাদ দিয়া এবং তাঁহার করুণার কার্য্য উল্লেখ করিয়া কয়েকটী অভঙ্গ রচনা করিলেন। এদিকে একটী আশ্চর্য্য ঘটনার দ্বারা রামেশ্বর ভট্টের মন একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, রামেশ্বর ভট্ট পুনা নগরের একটী কূপে স্নান করিলেন। কিন্তু স্নিগ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। পরে এই কথা উঠিল যে, তুকারামের প্রতি অত্যাচার করাতে তাঁহার এই দশা ঘটিয়াছে। পরে তুকারামের শরণাপন্ন হইলে পর, তিনি শান্তি লাভ করিলেন। এ ঘটনাটী কেহ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া স্বীকার করুন বা না করুন, রামেশ্বর ভট্ট যে তুকারামের এক জন প্রকৃত বন্ধু হইলেন এবং শেষে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

এই ঘটনাটীর পর, তুকারাম উৎসাহের সহিত কথা ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। লোহাগাভা তাঁহার প্রিয় স্থান ছিল। তথায় তিনি সর্ব্বদা গমন করিতেন। এই সময়ে তুকারামের যশ পরিব্যাপ্ত হইল। চারিদিক হইতে লোক তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। ক্রমে রাজা শিবজীর সমুদায় কর্ণগোচর হইল। রাজার মন ধর্ম্মপ্রবণ ছিল। তিনি তুকারামকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন। শিবজী তুকারামের নিকট একখানি নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলেন, এবং তাঁহাকে আনিবার জন্য আয়োজন করিয়া দিলেন। তুকারাম নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিলেন। সংসারের চাকচিক্যে তাঁহার মন আর মোহিত হয় না। অশ্ব, ধন ও মূল্যবান দ্রব্যাদি তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি নিমন্ত্রণ পত্রের প্রত্যুত্তরে সাতটী অভঙ্গ লিখিয়া পাঠাইলেন। তাহাতে, নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিবার কারণ নির্দ্দেশ করিলেন এবং তাহার সহিত, রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক গুলি সদুপদেশ দিলেন। অভঙ্গ গুলি পাঠ করিয়া, শিবজী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তুকারামের প্রতি তাঁহার ভক্তির ভাব এত প্রবল হইল যে, শিবজী স্বয়ং মহার্ঘ উপঢৌকন সহ, তুকারামকে আনিবার জন্য গমন করিলেন। তুকারাম তখন লোহাগাভা নামক স্থানে ছিলেন। শিবজী তথায় উপস্থিত হইয়া, তুকারামের চরণে প্রণিপাত করত উপঢৌকন প্রদান করিলেন। তুকারাম তাহা অস্বীকার করিলেন। কিন্তু নানা প্রকার সদুপদেশ দ্বারা রাজাকে সন্তুষ্ট করত বিদায় করিয়া দিলেন।

ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের চরিত্র পাঠ করিলে দেখা যায় যে, যত দিন না তাঁহারা অন্তরের রিপু সকল দমন করিতে পারেন, তত দিন তাঁহারা ঈশ্বরকে লাভ করিতে সক্ষম হয়েন না। আর ইহাও বিশেষরূপে প্রতীয়মান

হয় যে, কাম রিপু অনেকের পক্ষে ধর্ম্ম সাধনের বিঘ্ন স্বরূপ হইয়া উঠে। হাব ভাব সম্পন্না লাবণ্যবতী রমণীর কুহকে পড়িয়া কত ফল মূল আহারী তপস্বী পর্য্যন্ত স্খলিত-পদ হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মবীরগণ এই প্রলোভনকে অতিক্রম করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছেন। কাম রিপুকে ভস্মসাৎ করিয়া,মহাদেব মহাযোগী বলিয়া বিখ্যাত; এবং ধর্ম্ম বীর শাক্য সিংহ মহাবিক্রমশালী মারকে পরাজয় করিয়া নির্ব্বাণ-পদ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তুকারামও এই প্রবল রিপুর সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইয়া ছিলেন। একটী লাবণ্যবতী রমণী সর্ব্বদাই তুকারামের কথা ও কীর্ত্তনাদি শুনিতেন। কিন্তু কামের কি আশ্চর্য্য প্রভাব, এই রমণীটীর মন ধর্ম্মভাবে অনুরঞ্জিত না হইয়া, ইনি তুকারামকে মন্দ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি এতদূর পর্য্যন্ত কাম রিপুর বশীভূত হইলেন যে, এক সময়ে তুকারামকে নির্জ্জনে পাইয়া তাহার মনের ভাব তাঁহার নিকটে প্রকাশ করিলেন। তুকারাম রমণীর কথা শুনিয়া সিহরিয়া উঠিলেন। তুকারাম তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী ব্যতীত তিনি সকল রমণীকে রুক্মিনীর ন্যায় জ্ঞান করেন। সুতরাং তিনি তাঁহার মাতার ন্যায় পূজনীয়া। অতএব এ প্রকার মন্দ কথা তাঁহার মুখ হইতে কখন যেন বহির্গত না হয়।

ইহার পর তুকারামের উপর আর একটী নিগ্রহ আসিয়া উপস্থিত হইল। তুকারাম যখন লোহাগাড়া গ্রামে কীর্ত্তন করিতে যাইতেন, সেখানকার এক জন কাঁশারী তাঁহার সহিত যোগ দান করিত। কাঁশারীর পত্নী অতিশয় সংকীর্ণমনা ছিল। সে দেখিল যে, তাঁহার স্বামী নিজ ব্যবসার প্রতি অবহেলা করত তুকারামের সহিত নৃত্যগীত করিয়া বেড়ায়। তুকারামের প্রতি তাহার বিদ্বেষ ভাব জন্মিল। এবং যাহাতে সংকীর্ত্তনাদি বন্ধ হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। মনের ভাব কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া কাঁশারীর পত্নী তুকারামকে এক দিন নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাটীতে আনিল। সাধুর প্রতি তাহার পত্নীর এ প্রকার ভক্তি ভাব দেখিয়া, কাঁশারী মনে মনে বড় আহ্লাদিত হইল। স্নানের সময় উপস্থিত হইলে সাধুকে গরম জলে স্নান করাইবার প্রস্তাব করিল। তুকারাম তেল মাখিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কাঁশারীর স্ত্রী অত্যন্ত উষ্ণ জল আনিয়া তুকারামের অঙ্গে ঢালিয়া দিল। সাধুর শরীর ঝলসিয়া গেল। তিনি জ্বালায় ছটফট করিতে লাগিলেন। কাঁশারীর স্ত্রীকে কোন কথা বলিলেন না। কেবল ভগবানের নিকট শান্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, এই দুষ্টা স্ত্রী সলজ্জিতা হইয়া সাধুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল এবং অবশেষে তাঁহার এক জন প্রকৃত ভক্ত হইয়াছিল।

হিন্দু সমাজে, সন্ন্যাসীদিগের বড় সম্ভ্রম। তাঁহারা লোক-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, ভগবানের স্থানীয় হইয়াছেন, লোকের এই প্রকার বিশ্বাস। যে গৃহে তাঁহারা পদার্পণ করেন, সে গৃহ পবিত্র হয়। গৃহস্থ তাঁহাদিগকে পুষ্পাদি দিয়া পূজা করে এবং তাঁহারা পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিলে, গৃহস্বামীর অন্তঃকরণে আর আনন্দ ধরে না। যাহারা যথার্থ সন্ন্যাসী, যাহারা

ঈশ্বরে সমুদায় সমর্পণ করিয়া তন্ময়াপন্ন হইয়াছেন, কে না তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া থাকে? কিন্তু এ অবনী মণ্ডলে প্রকৃত বিরক্ত সন্ন্যাসী কোথায়? অনেকে প্রকাশ্যে লোক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের অন্তঃকরণ অভিমানে পরিপূর্ণ। তাঁহারা পরমেশ্বরকে উপাস্য বলিয়া স্বীকার করেন না, যেহেতু তাঁহারা নিজে ভগবান। "আমি ব্রহ্ম" ইহাই তাহাদের বীজ মন্ত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই মহাপুরুষেরা ঈশ্বরকে পূজা করেন না বটে, কিন্তু তাঁহার স্থানে যন্ত-লিঙ্গাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ষোড়ব উপচারে তাহার পূজা করিয়া থাকেন। এই রূপ প্রকৃতির দুই জন সন্ন্যাসী, তুকারামের সুখ্যাতি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল দেখিয়া, ঈর্ষানলে জ্বলিতে লাগিল। কোথায় লোকে তাহাদিগকে দেবতা স্থানে পূজা করিবে, না এক জন মূর্খ শূদ্র অযথা রূপে সম্মানিত হইতে লাগিল। তুকারামকে দমন করা তাহারা আবশ্যক বিবেচনা করিল। এবং এই নিমিত্ত তাহারা রাজা শিবজীর এক জন কর্ম্মচারী দাদাজি কান্তাদেবের নিকট, তুকারামের বিরুদ্ধে এক আবেদন প্রেরণ করিল। আবেদনে লিখিত ছিল যে, তুকারাম শূদ্র হইয়া বেদ ব্যাখ্যা করিতেছে এবং লোকে তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছে। ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, এবং হিন্দু চূড়ামণি রাজা শিবজীর রাজ্যে এরূপ অত্যাচার যে প্রশ্রয় পাইতেছে, ইহা অতীব আশ্চর্য্য। এই অত্যাচারী শূদ্রকে সমুচিত দণ্ড না দিলে, রাজ্যে ধর্ম্ম বিপ্লব হইয়া উঠিবে। সন্ন্যাসীদ্বয়ের এই আবেদন উপেক্ষণীয় নহে। দাদাজি, রাজা শিবজীর নিকট এ বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। শিবজী তুকারামকে বিশেষ রূপে শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু, এ আবেদনটীকে অগ্রাহ্য করাও উচিত বিবেচনা করিলেন না। মন্ত্রীদলের সহিত পরামর্শ করিয়া এই স্থির হইল যে, তুকারামের সহিত সন্ন্যাসীদ্বয়ের শাস্ত্র বিচারের আজ্ঞা প্রদান করা হউক। এবং ইহাতে তুকারাম পরাজিত হইলে তাহাকে দণ্ড দেওয়া হইবে। সন্ন্যাসীদ্বয়কে এই কথা বলা হইল, এবং ইহাতে তাহারা সম্মতি প্রদান করিল। তুকারামকে পুনা নগরে আনিবার জন্য অনুজ্ঞা প্রচার হইল। তুকারাম তাঁহার কয়েক জন সঙ্গিকে লইয়া সঙ্গমের নিকট উপস্থিত হইয়া তথায় কিছুকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। দাদাজি তাঁহার আগমন বার্ত্তা অবগত হইয়া স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে নগর মধ্যে লইয়া আসিলেন। কোন বিশেষ স্থানে একটা বিরাট সভা আহূত হইল। নানা স্থানের বিখ্যাত পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। বিচারের মীমাংসা করিবার ভার পণ্ডিতগণের উপর অর্পিত হইল। বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে দাদাজি তুকারামকে কীর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলেন, তুকারাম এরূপ ভক্তির সহিত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন যে, শ্রোতাগণ একেবারে মোহিত হইলেন। এমন কি তুকারামের বিরোধী ব্যক্তিগণের কঠিন হৃদয়ও আর্দ্র হইয়া গেল। এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উল্লিখিত দুই জন সন্ন্যাসী কীর্ত্তন শুনিয়া এ প্রকার অভিভূত হইলেন যে, তাঁহারা তুকারামের সমক্ষে নত-শির না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। দাদাজি এই

দৃশ্যটী নয়ন গোচর করিয়া, সন্ন্যাসীদ্বয়কে ভৎর্সনা করিলেন এবং সভা সমক্ষে তাঁহাদের পরাজয় ঘোষণা করিয়া দিলেন। সন্ন্যাসীদ্বয়ও লজ্জিত হইয়া পরাজয় স্বীকার করিলেন।

তুকারামের প্রকৃত দিগ্বিজয় হইল। সমুদায় বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি এখন নির্ভয় চিত্তে কথা ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাহার শত্রুগণ যে কৌশল জাল বিস্তার করিয়াছিল, তাহাতে তাহারা নিজেই আবদ্ধ হইল। তুকারাম এখন মেঘ-মুক্ত দিবাকরের ন্যায় স্বর্গীয় প্রভা বিকীর্ণ করিয়া আপামর সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। দাক্ষিণাত্য ভক্তিভাবে অনুরঞ্জিত হইল।

তুকারামের জীবন কি প্রকারে শেষ হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। সাধারণ বিশ্বাস এই যে তিনি দেব বিমানে আরোহণ করত বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। তুকারামের জীবন চরিত্রে লিখিত আছে যে, তিনি তাঁহার অন্তর্দ্ধানের কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহার সহধর্ম্মিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার সমভিব্যাহারে তীর্থ দর্শনে গমন করিবেন কি না। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, তিনি তীর্থ দর্শনে গমন করিয়াছিলেন এবং হয়ত, কোন নিভৃত স্থানে তপস্যায় নিরত ছিলেন। ক্রমশঃ

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

# নদী উপকূলে।

১

প্রকৃতির অন্তরে ডুবিয়া,
সব দুঃখ গেলাম ভুলিয়া!
ক্ষণেক এ ভাবে রই,
ক্ষণেক আলোক পাই,
ক্ষণ থাকি মরমে মজিয়া,
শোক তাপ গেলাম ভুলিয়া!

২

শোক তাপ কিছু নাই,
সুখ ভরে কান্দি যাই,
আমিও কি সুখী, ভাই, এভবসংসারে?
আহা! নেত্র ভাসিল শিশিরে!
আমি কি গো সুখী,
আমি কি গো সুখী?
চিরদুঃখী আছি পড়ি,আমিও কি সুখী!

৩

প্রকৃতির বুকেতে মরিয়া,
সব দুঃখ গেলাম ভুলিয়া,
বাসনা মনের নাই,
কেবল প্রকৃতি চাই,
এই ভাবে থাকি নিরন্তর,
অন্তিমে মরণ ধরি পশি গো আঁধার!

৪

কিছু মনে রাখিব না,
কত কত কি প্রাণে বেদনা!
যাহা কিছু আছে মনে গেলাম পাসরি,
আজিশূন্য প্রাণে আমি, আমরি! আমরি!

৫

সংসারের যাতনা বহিতে,আজি ফিরিব না,
ক্ষণেক বিরামে রই,
ক্ষণেক জীবন পাই,

মগ্ন থাকি লইয়া আপনা!
পৃথিবী যে পদ চায়,
মনে আঁখি নাহি লয়,
ধন মান জ্ঞান মদ, থাকুক পড়িয়া দূরে,
ক্ষণেক ডুবিয়া থাকি প্রকৃতি-ভাব আঁধারে!

৬

নীরব লইয়া বুকে,
প্রকৃতি লইয়া মুখে,
থাকি পড়ি গাঙ্গিনীর কূলে!
চেতনে মরিয়া থাকি,
জনম ভুলিয়া থাকি,
পড়ি থাকি প্রকৃতির কোলে!
দিন বয়ে যায় যায়,
নয়ন না দিব তায়;
মুদিত নয়ন, চির আঁধারে ডুবিতে চায়,
ক্ষণপরে মৃত্যু আসি লইয়া যাবে কোথায়!

৭

প্রকৃতি মা! যে সুখ লভিনু আজি ও দুটী
চরণে মিলি,
জনমে জনমে চিতে থাকে যেন এই স্মৃতি!
কখন কোথায় থাকি,
কালস্রোতে কোথা ভাসি,
জীবনের শোক তাপ সহিতে কতই বাকী?
একা একী পথে যাই,
কিম্বা জনস্রোতে ধাই,
দুর্ব্বার অদৃষ্টচক্রে যেথা রহি যাই,—
নগরে, প্রান্তরে, বনে, দেশ দেশান্তরে,
বিজন প্রবাসে, কিম্বা দরিদ্র কুটীরে,
যেথা যাই, সেথা রই,
যতভোগী, যত সই,
জুড়াই এহিয়া যেন স্মৃতির মুহুলকরে!
এই গো মিনতি,মাত! রাখি যাই আশাভরে!
ও মুখ কিরণ পানে, যতনে ক্ষণ নেহারি,
আমার সে পথ যেন খুজিয়া লইতে পারি!
মনে কত কথা আসে,
পূর্ব্বস্মৃতি ক্ষণ হাসে,
জন্ম জন্মান্তর কথা কে যেন আনিয়া দেয়,
আপনার বাড়ী লাগি ধীরি ধীরি মায়া হয়!
আবার আপন বশে, চলিব আপন পথে,
আর যে আমায় ছাড়ি দিবনাগো কারুহাতে।
প্রকৃতি মা! প্রকৃতি মা!
আমি যে দুয়ারে আজি,কি আর বলিব,ওমা!
(ডাকিতে জানিনা, ওমা!)

শ্রীচন্দ্রকান্ত সেন।

---

## ফুল ও ফল। (১)

### (সমালোচন)

বাবু চন্দ্রনাথ বসু বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব স্থল। তিনি যে সকল প্রবন্ধে সময়ে সময়ে বঙ্গদর্শনকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহারই কতকগুলি এই গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। আজি কালি বাঙ্গালা সাহিত্যের ফোড়ে-পটিতে পুস্তকের নাম সুললিত করিবার জন্ত যেমন বিনোদিনী, কুরঙ্গিনী, স্বন্ স্বন্ সমীরণ, কুহু কুহু, প্রভৃতি শ্রবণ মধুর (?) নামে নামকরণ কার্য্য হয়, এনামকরণ সে প্রণালীর নহে। ফুল ও ফল নামের স্বার্থকতা আছে। প্রথম প্রবন্ধ, ফুলের বৃন্ত (ধ্যান)। অগভীর, বিষবাদী,

(১) শ্রীচন্দ্রনাথ বসু এম্‌ এ প্রণীত। এবং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রেসে প্রকাশিত; মূল্য বার আনা।